Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

ইসলামি নারী শিক্ষার অভাবে পারিবারিক অবক্ষয় কারন ও প্রতিকার

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: সাইফুদ্দীন শাকিল

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

মনিরা খাতুন

রোলঃ ২৩১০০১২০১২৫

৩১ মে, ২০২৬ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

ইসলামি নারী শিক্ষার অভাবে পারিবারিক অবক্ষয় কারন ও প্রতিকার

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: সাইফুদ্দীন শাকিল

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

মনিরা খাতুন

রোলঃ ২৩১০০১২০১২৫

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " ইসলামি নারী শিক্ষার অভাবে পারিবারিক অবক্ষয় কারন ও প্রতিকার " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে মনিরা খাতুন, আইডিঃ ২৩১০০১২০১২৫ বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: সাইফুদ্দীন শাকিল
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মাও: আলী হাসান
তাজবীদ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " ইসলামি নারী শিক্ষার অভাবে পারিবারিক অবক্ষয় কারন ও প্রতিকার " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: সাইফুদ্দীন শাকিল উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব প্রচেষ্টায় প্রস্তুত করা হয়েছে, যেখানে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে এবং সেগুলো যথাযথভাবে তথ্যসূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

মনিরা খাতুন

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

৩১ মে, ২০২৬ ইং

মনিরা খাতুন

আইডিঃ ২৩১০০১২০১২৫

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

১, ভূমিকা.....6

২, ইসলামে নারীর মর্যাদা.....7

৩, ইসলামী নারী শিক্ষার গুরুত্ব.....12

৪,নারী শিক্ষার পদ্ধতি ও রুপরেখা.....14

৫,নারীর ফরজ ইলম 16

৬,ধর্মীয় জ্ঞানের আবশ্যকতা:.....17

৭, একজন আদর্শ নারীর গুণাবলী: 20

২য় অধ্যায়: পরিবার.....21

১,বিয়ের আগে বোনেদের মানসিক প্রস্তুতি.....21

২, বিবাহ:*.....22

৩,বহুবিবাহ সম্পর্কে ইসলাম কী বলে - কুরআন ও হাদিসের আলোকে* 30

৪,জীবনের নতুন অধ্যায় : পরীক্ষার মুহূর্ত*.....33

৫,স্বামীর আনুগত্য ও মন বোঝার চেষ্টা - ইসলামিক দৃষ্টিকোণ*.....36

৬,কম্বাইন্ড ফ্যামিলি ম্যানেজমেন্ট - শান্তিতে থাকার উপায়:* 45

৭*সন্তান লালন-পালন ও তারবিয়াহ* 48

অধ্যায়:৩ পারিবারিক অবক্ষয়ের কারণ.....52

১,পর্দাহীনতা:.....52

২,ফ্রি-মিক্সিং সভ্যতা - ইসলামের দৃষ্টিতে*.....57

৩,কর্মক্ষেত্রে ফ্রি -মিক্সিং এর প্রভাব:.....63

৪,র্নিলজ্জ পশ্চিমা নারীদের অন্ধ অনুসরণ : 74

৫,#স্ত্রীর প্রতি স্বামীর অবহেলা: 82

৬,*বউ-শাশুড়ি প্রতিযোগিতা* 87

অধ্যায় :৪-পারিবারিক অবক্ষয়ের প্রতিকার।.....95

১,পরিবারকে ভালোবাসায় বেঁধে রাখা:.....95
২,বিনয় সমঝোতার প্রথম সোপান.....99
৩,কষ্টসয়ে যাওয়া:.....102
৪,রাগ দমন:.....106
৫,ভালো কিছু প্রত্যাশা না করা 109
৬,দুনিয়ায় বদলা নেওয়ার মানসিকতা না রাখা"*.....114
৭,সারমর্ম: 116
তথ্য সূত্র.....117

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ
إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ، نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

১, ভূমিকা

"ইসলামিক নারী শিক্ষার অভাবে পারিবারিক অবক্ষয়: কারন ও প্রতিকার" নামক এই গবেষণায় ইসলামিক নারী শিক্ষার মৌলিক গুরুত্ব এবং এর অভাবে সমাজ ও পরিবারে যে নৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবক্ষয় দেখা দেয় তা বিশ্লেষণ করা হয়েছে। ইসলামে জ্ঞান অর্জন নর-নারী উভয়ের জন্য ফরজ, আর নারীরাই পরিবারের প্রথম মাদ্রাসা। একজন শিক্ষিত মা একটি শিক্ষিত জাতি গড়ে তোলেন - এই বাস্তবতা ইসলামের শুরু থেকেই স্বীকৃত।

বর্তমান সমাজে পাশ্চাত্য সংস্কৃতির প্রভাব, অর্থনৈতিক চাপ এবং ধর্মীয় জ্ঞানের ঘাটতির কারণে নারী শিক্ষা অনেক ক্ষেত্রে উপেক্ষিত হচ্ছে। এর ফলে সন্তান প্রতিপালনে ভুল, পারিবারিক মূল্যবোধের দুর্বলতা এবং প্রজন্মের মধ্যে ইসলামিক আদর্শের অভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে। পাশাপাশি পারিবারিক বিচ্ছেদ, সন্তানের বিপথগামীতা এবং সামাজিক অস্থিরতাও বৃদ্ধি পাচ্ছে।

এই গবেষণার উদ্দেশ্য হলো নারী শিক্ষার অভাবে পারিবারিক অবক্ষয়ের মূল কারণগুলো চিহ্নিত করা এবং কুরআন-সুন্নাহর আলোকে তার প্রতিকার খুঁজে বের করা। একই সাথে ইসলামিক শিক্ষা কিভাবে একটি সুস্থ, সুসংহত ও মূল্যবোধসম্পন্ন পরিবার গঠনে ভূমিকা রাখতে পারে তা তুলে ধরা হবে। গবেষণাটি কেবল তাত্ত্বিক নয়, বরং বাস্তব সমস্যার সমাধানমুখী দিকনির্দেশনাও দেবে, যা পরিবার ও সমাজ সংস্কারে সহায়ক হবে।

২, ইসলামে নারীর মর্যাদা

যখন জীবন্ত প্রোথিত কন্যা সন্তানকে জিজ্ঞেস করা হবে;কোন্ অপরাধে তাকে হত্যা করা হয়েছিল।-সূরা তাকভীর, আয়াত : ৮-৯

এই আয়াতে নারীর বিষয়ে জাহেলী যুগের দৃষ্টিভঙ্গি ফুটে উঠেছে। সে সমাজে পুরুষ ও জীবজন্তুর মধ্যস্থলে ছিল নারীর অবস্থান। কন্যা সন্তানের জন্ম সেখানে ছিল অভিশাপ আর অপমানের বিষয়। যেন তা মহাপাপ বা স্থায়ী অমর্যাদার কারণ। অপমানবোধ আর মর্যাদা রক্ষায় জীবন্ত কবর দেয়া হতো কন্যা সন্তানকে। কত হীন মানসিকতা ও কতটা অপমানবোধ হলে মানুষ নিজের ঔরসজাত সন্তানকে জীবন্ত পুঁতে ফেলতে পারে! সেখানে তো নারীকে মানুষ বলেই গণ্য করা হতো না। না নিজের সত্তার ওপর ছিল তার কোনো অধিকার, না সম্পদের উপর; বরং সে নিজেই ছিল সম্পদ;ওয়ারিসসূত্রে যার হাত বদল হত।

ইসলাম এল, নারী মুক্তি পেল। ঘোষণা হল, কত নিষ্ঠুর তোমাদের এ কাজ।

কন্যা সন্তানের জন্মকে বলা হল ‘সুসংবাদ’

يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ l وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ

তাদের কাউকে যখন কন্যা সন্তানের ‘সুসংবাদ’ দেয়া হয় তখন তার চেহারা মলিন হয়ে যায় এবং সে অসহনীয়

মনস্তাপে ক্লিষ্ট হয়। সে এ সুসংবাদকে খারাপ মনে করে নিজ সম্প্রদায় থেকে লুকিয়ে বেড়ায় (এবং চিন্তা করে) হীনতা স্বীকার করে তাকে নিজের কাছে রেখে দেবে,নাকি মাটিতে পুঁতে ফেলবে। কত নিকৃষ্ট ছিল তাদের সিদ্ধান্ত। (সূরা নাহ্ল,আয়াত : ৫৮-৫৯)

কন্যা সন্তানের জন্মকে বলা হচ্ছে

‘সুসংবাদ’

আধুনিক জাহেলী যুগে আজো কিন্তু নারীর জন্ম ‘সুসংবাদ’ নয়

তখন নারীকে পুঁতে ফেলা হতো জন্মের পর। আর এখন পুঁতে ফেলা হয় জন্মের আগেই (বিজ্ঞানের কল্যাণে যখন জানতে পারে আগত শিশু নারী)

অধিকার আর মর্যাদা কি কাগজে কলমে আর শ্লোগানে সম্ভব? হৃদয় যদি মেনে না নেয়, ছিড়ে যায় কাগজ, ভেঙে যায় কলম, থেমে যায় শ্লোগান।

জাহেলী যুগে নারী ছিল অবহেলিত নির্যাতিত, নারীর প্রতি পুরুষের হীন মানসিকতার কারণে। ইসলাম সে মানসিকতারই সংশোধন করেছে।

নারী ছিল পুরুষের কাছে অন্যান্য ভোগ্য পণ্যের মত। ইসলাম নারীকে বানাল পুরুষের অর্ধাঙ্গিনী। নারী নিজেই ছিল পুরুষের সম্পদ, যা ভোগ দখল করা যেত, ইসলাম নারীকে দিল সম্পদের অধিকার। কারো অধিকার নেই তার সম্পদে। কিন্তু তার আছে অধিকার পিতার সম্পদে,স্বামীর সম্পদে, সন্তানের সম্পদে। তার ভরণ পোষণের দায়িত্ব হয় পিতার, নয় স্বামীর, না হয় সন্তানের। কেউ নেই তো রাষ্ট্রের। নারী অভিভাবকহীন নয়;জন্ম থেকে

মৃত্যু পর্যন্ত।

কিন্তু একটি পুরুষ এই অধিকার ভোগ করার অধিকার রাখে কেবল বালেগ হওয়া পর্যন্ত। পশ্চিমে অবশ্য নারীর বেলায়ও তাই। ফলে তাকে পড়তে হয় বিপদে। আর এটাই হয়তো ‘সমঅধিকার’ দাবিদারদের ইনসাফ(?!)

মত প্রকাশের কোনো স্বাধীনতা নারীর ছিল না। ইসলাম বলল, না;তার মতামত ছাড়া হবে না। স্বামী গ্রহণে নারীর মতই চূড়ান্ত। যদি সে ন্যায়ের উপর থাকে।

জাহেলী যুগের নির্যাতিতা,অবহেলিতা নারী নবীর দরবারে এসে বলার অধিকার পেল, আল্লাহর রাসূল! আমার স্বামী আমার প্রাপ্য হক দেয়নি। বলতে পারল নিজের পছন্দ অপছন্দের কথা; 'না, অমুক আমার পছন্দ নয়।'

তবে নারীর ভরণ পোষণে যেমন তার অভিভাবক দায়িত্বশীল,যেন ভরণ পোষণের পিছে ছুটতে গিয়ে সে ক্ষতির সম্মুখীন না হয় (যেমনটি ঘটে পশ্চিমা নারীর বেলায়, জীবিকার অর্জনে সবকিছু বিসর্জন দিতে হয়) তেমনি নারী যাতে বৈবাহিক জীবনেও ক্ষতির সম্মুখীন না হয় এ ব্যাপারেও নারীর অভিভাবক দায়িত্বশীল। জীবনের কোনো ক্ষেত্রেই নারীকে অনিরাপদ ছেড়ে দেয়নি ইসলাম। তবে নারীকে দিয়েছে মত প্রকাশের অধিকার। অভিভাবক যদি তার প্রতি অবিচার করে, সে বলতে পারবে।

অধীনতা থেকে মুক্ত হয়ে নারীকে স্বাধীনতার দাওয়াত দেয়া হচ্ছে। কিন্তু এ স্বাধীনতা বা অধীনতামুক্ত হওয়ার অর্থ কী? পিতা ও স্বামীর অধীনতা থেকে মুক্ত হয়ে স্বার্থান্বেষী,কপট শত পুরুষের অধীন হওয়া। অধীনতামুক্ত বলে কোনো বিষয় নেই। (একমাত্র আল্লাহই অধীনতামুক্ত)

নারীকে আহবান জানানো হচ্ছে স্বনির্ভর হতে, নিজের পায়ে দাঁড়াতে। কিন্তু পায়ের তলের ঐ মাটিই যদি নারীকে গ্রাস করতে উন্মুখ হয় তখন?

ইসলাম দিল নারীর নিরাপত্তা। নারীর প্রতি চোখ তুলে তাকানোও নিষেধ। পুরুষকে বলে দিল, হে পুরুষ! তোমার দৃষ্টি অবনত রাখ, আর লজ্জাস্থানের হেফাজত কর। আরো বললো, কোনো পুরুষ যেন কোনো বেগানা নারীর সাথে নির্জনে মিলিত না হয়। কারণ, তা নারীর বিপদের কারণ হতে পারে। নারীর প্রতি সকল প্রকারের অন্যায়কে ঘোষণা করল মহাপাপ, কঠিন শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলে।

আর নারীকেও বাতলে দিল নিরাপদ থাকার পথ।

আজকের ‘পুরুষতান্ত্রিক’ সমাজ নারী মুক্তির মেকি শ্লোগান দিয়ে কী পেতে চায়? আর নারীকেই বা কী দিতে চায়? নইলে নারীকে কেন হতে হয়; নতুন মডেলের গাড়ির ‘মডেল’,পণ্যের এ্যাডে ‘নারীপণ্য’? অর্থের বিনিময়ে কেন কেনা যায় নারীর রূপ-যৌবনের চিত্র? নারীকে রক্ষা না করে কেন তাকে ধোকা দেয়া হয় এই বলে, ‘তুমি যৌনকর্মী (তুমি কর্ম করে খাচ্ছ)? নারী কেন ওয়েটার? কেন সে রূপ-যৌবন নিলামকারী বিমানবালা,সেলসম্যান? কেন ইডেন,জাহাঙ্গীরনগর ও অন্যান্য নারী কেলেঙ্কারী নারীবাদী সংগঠনগুলোর আন্দোলনের বিষয় হয় না....? আরো কত শত দৃষ্টান্ত,যা কারো অজানা নয়। তারপরও...?

ওরা যদি নারীর মর্যাদা,অর্থনৈতিক নিরাপত্তাই চাইত,তাহলে নারীর মর্যাদা আর নিরাপত্তা রক্ষা হয় এমন পথই বেছে নিত। যেটা করেছে ইসলাম। ইসলাম কি নারীর অর্থনৈতিক নিরাপত্তাকে অস্বীকার করে? তাহলে দেন মোহর,মিরাস এবং মর্যাদা ও নিরাপত্তা ঠিক রেখে অর্থ উপার্জনের অধিকার কেন দিয়েছে? (তার উপর তো কারো ভরণ পোষণের দায়িত্ব নেই)

নারী শুধু ভাবে, নারীর জন্য এত শর্ত কেন ইসলামে? তারই নিরাপত্তার জন্য,মর্যাদা রক্ষার জন্য।

ইসলাম কি শিক্ষার অধিকার দেয়নি নারীকে? দিয়েছে। কিন্তু শিক্ষার নামে নিরাপত্তাহীন পরিবেশে ছেড়ে দেয়নি।

তাই আজ ভাবতে হবে, কে নারীর প্রকৃত কল্যাণকামী?

সব শ্লোগান যখন থেমে যায়,নারীর যখন চোখ খোলে (সবকিছু হারানোর পর) তখন সবকিছুর দায় ও বোঝা কাকে বহন করতে হয়? এমনকি পশ্চিমেও? আর আইন? সেওতো অবলা হয়ে গেছে!

ইসলাম দিয়েছে নারীর নিরাপত্তা আর মর্যাদা। শুধু তাই নয়,যে পুরুষের কাছে নারীর কোনো মর্যাদা ছিল না, তার চরিত্রের ভালো মন্দের বিচারক বানানো হল নারীকে। ঘোষণা হল, তোমাদের মধ্যে সেই পুরুষ সবচেয়ে ভালো যে তার স্ত্রীর কাছে ভালো।

নারী নাম উচ্চারণ ছিল অপমানের, সেখানে আল কুরআনের সূরার নাম হল 'নারী' (সূরা নিসা) । ,

ঘোষণা হল,নারীকে স্বযত্নে লালন পালন করা পিতামাতাকে নিয়ে যাবে জান্নাতে।

যে 'রব' নারীকে অবহেলা আর জুলুমের আঁস্তাকুর থেকে তুলে এনে এত অধিকার,ইনসাফ আর মর্যাদা দিলেন তিনি কি তাঁর অমঙ্গল চান? তাহলে তার নির্দেশনার সাথে বিদ্রোহ কেন? নারীর কল্যাণ ও মুক্তি তাঁর নির্দেশনায় নাকি চতুর স্বার্থান্বেষী ভোগবাদীদের মেকি শ্লোগানে?!নারী ছিল মা হাওয়া। আদমের অর্ধাঙ্গিনী,জীবনসঙ্গিনী। তারপর? তারপর অলক্ষুণে, ভোগের পণ্য, অমর্যাদার কারণ। তারপর আবার কন্যা, জায়া,জননী। নারীর পায়ের তলে সন্তানের জান্নাত। মর্যাদার সুউচ্চ শিখরে সমাসীন। মত প্রকাশে স্বাধীন, নিজের সম্পদের একচ্ছত্র আধিকারী। তারপর? তারপর আবার অপ্রত্যাশিত নারীর জন্ম, অধিকারের মেকি শ্লোগানে বঞ্চিত,ধোকাগ্রস্ত। আবার ভোগের পণ্য! নিলামের পণ্য। সে যুগেও কেনা বেচা হতে,এখনো...! সেদিন জুলুম ছিল, চতুরতা ছিল না। কিন্তু আজ...? সেদিনও পৃথিবীতে তার আগমন ছিল অপ্রত্যাশিত,আজও...! সে যুগের কবি নারীর রূপ যৌবন,যৌবনের আবেদন নিয়ে আলোচনা করত কবিতায়, আর আজ তার রূপ-যৌবন ফেরি করা হয় টিভি পর্দায়। আর কত বলবো, ইতিহাসের পাতা ভারাক্রান্ত হয়ে আছে এ অন্যায়ের বিবরণে; গ্রীক সভ্যতায়, ভারতীয় সভ্যতায়,চীন-সভ্যতায়,বৌদ্ধ ধর্মে, ইহুদী ধর্মে, খ্রীষ্টধর্মে, হিন্দু ধর্মে অমর্যাদা,অবহেলা আর জুলুমের যুপকাষ্ঠে বলি হয়েছিল নারী ও নারীত্ব। ইসলাম তাকে সেখান থেকে রক্ষা করে সমাসীন করেছে মর্যাদার সুউচ্চ শিখরে।

আদর্শহীন পুরুষ ইসলামে স্বীকৃত হক যথাযথ দেয় নি। তার দায় তো ফেলা যায় না ইসলামের উপর। যে ইসলাম ইনসাফ ফিরিয়ে দিল, তাকেই অভিযুক্ত করা হল না-ইনসাফির অপবাদে?!

আজ নারীর নিজেকেই নির্ণয় করতে হবে, কে তার কল্যাণকামী আর কে শঠ ও প্রবঞ্চক।

৩, ইসলামী নারী শিক্ষার গুরুত্ব

দ্বীনী ইলম অর্জন করা প্রতিটি মুসলিম নর-নারীর উপর ফরয। ইসলামে নারী শিক্ষা ফরজ হওয়ার সবচেয়ে স্পষ্ট হাদিস হলো এটা:

হাদিস
আরবি:

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ

উচ্চারণ:
ত্বলাবুল ইলমি ফারীদ্বাতুন আলা কুল্লি মুসলিম

অর্থ:
*"জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর উপর ফরজ"

দ্বীনী ইলম ছাড়া দ্বীনের উপর চলা সম্ভব নয়।

এখানে "কুল্লি মুসলিম" শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, যার অর্থ প্রত্যেক মুসলিম। নর-নারী উভয়কেই সরাসরি উল্লেখ করা হয়েছে। তাই নারী শিক্ষাকে ঐচ্ছিক বলার সুযোগ নেই।

ইসলামে নারী শিক্ষা শুধু অনুমোদিত নয়, বরং *ফরজ* হিসেবে ঘোষিত। পুরুষের মতো নারীর জন্যও জ্ঞান অর্জন বাধ্যতামূলক। এর দলিল কুরআন ও সহিহ হাদিসে স্পষ্টভাবে আছে।

১. কুরআনের আলোকে নারী শিক্ষার ফরজ বিধান
আল-'আলাক ৯৬:১

ٱقۡرَأۡ بِٱسۡمِ رَبِّكَ ٱلَّذِي خَلَقَ

পড় তোমার রবের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন।

- কুরআনের প্রথম ওহীই হলো *"ইকরা"* অর্থাৎ *"পড়ো"* - সূরা আলাক: ১। এখানে নির্দিষ্ট করে "পুরুষ পড়ো" বা "নারী পড়ো" বলা হয়নি। বরং সমগ্র মানবজাতিকে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে। তাই নারী-পুরুষ উভয়ের উপরই পড়ার বিধান প্রযোজ্য।
- আল্লাহ তায়ালা বলেন: _"
আয-যুমার ৩৯:৯

أَمَّنۡ هُوَ قَٰنِتٌ ءَانَآءَ ٱلَّيۡلِ سَاجِدٗا وَقَآئِمٗا يَحۡذَرُ ٱلۡأٓخِرَةَ وَيَرۡجُواْ رَحۡمَةَ رَبِّهِۦۗ قُلۡ هَلۡ يَسۡتَوِي ٱلَّذِينَ يَعۡلَمُونَ وَٱلَّذِينَ لَا يَعۡلَمُونَۗ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُوْلُواْ ٱلۡأَلۡبَٰبِ

যে ব্যক্তি রাতের প্রহরে সিদজাবনত হয়ে ও দাঁড়িয়ে আনুগত্য প্রকাশ করে, আখিরাতকে ভয় করে এবং তার রব-এর রহমত প্রত্যাশা করে (সে কি তার সমান যে এরূপ করে না) বল, 'যারা জানে আর যারা জানে না তারা কি সমান?' বিবেকবান লোকেরাই কেবল উপদেশ গ্রহণ করে।

। এ আয়াত থেকে বোঝা যায় ইসলামে জ্ঞানী ও অজ্ঞ ব্যক্তি সমান নয়। আর এই জ্ঞান অর্জনের আদেশ নর-নারী উভয়ের জন্য।
- আরেক আয়াতে আল্লাহ বলেন:
আল-মুজাদালাহ ৫৮:১১

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا قِيلَ لَكُمۡ تَفَسَّحُواْ فِي ٱلۡمَجَٰلِسِ فَٱفۡسَحُواْ يَفۡسَحِ ٱللَّهُ لَكُمۡۖ وَإِذَا قِيلَ ٱنشُزُواْ فَٱنشُزُواْ يَرۡفَعِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمۡ وَٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡعِلۡمَ دَرَجَٰتٖۚ وَٱللَّهُ بِمَا تَعۡمَلُونَ خَبِيرٞ

হে মুমিনগণ, তোমাদেরকে যখন বলা হয়, ‘মজলিসে স্থান করে দাও’, তখন তোমরা স্থান করে দেবে। আল্লাহ তোমাদের জন্য স্থান করে দেবেন। আর যখন তোমাদেরকে বলা হয়, ‘তোমরা উঠে যাও’, তখন তোমরা উঠে যাবে। তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং যাদেরকে জ্ঞান দান করা হয়েছে আল্লাহ তাদেরকে মর্যাদায় সমুন্নত করবেন। আর তোমরা যা কর আল্লাহ সে সম্পর্কে সম্যক অবহিত।

_"আল্লাহ তোমাদের মধ্য থেকে যারা ঈমান এনেছে এবং যাদের জ্ঞান দান করা হয়েছে, তাদের মর্যাদা বহুগুণে বৃদ্ধি করেন"। এখানেও নারী-পুরুষের মধ্যে কোনো পার্থক্য করা হয়নি।

৪,নারী শিক্ষার পদ্ধতি ও রুপরেখা

সূরা আন-নূর, আয়াত ৩১

আরবি:

وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۖ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۖ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ ۖ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ ۚ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

বাংলা অর্থ:

*"আর মুমিন নারীদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টি সংযত রাখে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হেফাযত করে। আর তারা যেন তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে, তবে যা সাধারণত প্রকাশ হয়ে থাকে। আর তারা যেন তাদের ওড়না দিয়ে বক্ষদেশ আবৃত করে রাখে। আর তারা যেন তাদের স্বামী, পিতা, শ্বশুর, পুত্র, স্বামীর পুত্র, ভাই, ভ্রাতুষ্পুত্র, ভগ্নিপুত্র, নিজেদের নারীগণ, নিজের অধিকারভুক্ত দাসী, যৌনকামনা রহিত পুরুষ এবং নারীদের গোপন অঙ্গ সম্পর্কে অজ্ঞ বালক ছাড়া কারো কাছে নিজেদের

সৌন্দর্য প্রকাশ না করে। আর তারা যেন তাদের গোপন সাজ-সজ্জা প্রকাশ করার জন্য সজোরে পদচারণা না করে। হে মুমিনগণ, তোমরা সবাই আল্লাহর নিকট তাওবা কর, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার।"*
- সূরা আন-নূর: ৩১

নারীর উপর যেমন ফরজ ইলম অর্জন ফরজ তেমন পর্দাও ফরজ।তবে, কুরআন - সুন্নাহ আল্লাহ ও রাসুলের নির্দেশিত পবিত্র শিক্ষা থেকে বঞ্চিত করে মুসলিম মেয়েদের কলেজ ইউনিভার্সিটি পাঠানো না জানি কোন চেতনা!
আত্মমর্যাদা ও অগ্রগতির বিষয়ে! নিশ্চয়ই এটি মুসলিম মেয়েদের প্রতি অন্যায় ও অবিচারের,তাদের দ্বীন ইমান এবং লজ্জা ও শালীনতা ধংস করার কুৎসিত ষড়যন্ত্র।

যদি দীনি জ্ঞান অর্জন বাদ দিয়ে দুনিয়াবি জ্ঞান - বিজ্ঞান ও শাস্ত্র ডিগ্রি অর্জনের জন্য মেয়েদের কলেজ ইউনিভার্সিটি পাঠানো হয়,তাহলে স্মরণ
রাখতে হবে নারীসত্ত্বার জন্য এসব থেকে অজ্ঞ থাকাই আল্লাহ তায়ালার নিকট অধিক পছন্দনীয় বৈশিষ্ট্য। এজন্য আল্লাহ তায়ালা মুমিন নারীর বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন
তারা হবে দুনিয়াবি বিষয়ে অজ্ঞ এবং আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসী

প্রশ্ন: নারীদের শিক্ষালায় কোথায় হবে?
❁ উত্তর:**সূরা আল-আহযাব, আয়াত ৩৩*

আরবি:
وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ ۖ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

বাংলা অর্থ:
*"আর তোমরা নিজ গৃহে অবস্থান করবে এবং প্রাচীন জাহেলী যুগের মতো নিজেদেরকে প্রদর্শন করে বেড়াবে না। আর তোমরা নামায কায়েম করবে, যাকাত প্রদান করবে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করবে। হে নবী পরিবার! আল্লাহ

তো কেবল চান তোমাদের থেকে অপবিত্রতা দূর করতে এবং তোমাদেরকে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র করতে।"*

- সূরা আল-আহযাব: ৩৩

অর্থ্যাৎ নারীরা চারদেয়ালের মধ্যেই ধর্মীয় জ্ঞান লাভ করবে যেন, পর্দা ও হিজাবের কারনে লজ্জা, শালীনতা ও সম্মান রক্ষা পায়।

৩. রাসূল (সা.) এর বাস্তব নীতি

- রাসূল (সা.) মসজিদে নবীতে নারীদের জন্য আলাদা সময় নির্ধারণ করেছিলেন যাতে তারা দ্বীনি শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে।

- সাহাবীয়া নারীরা রাসূল (সা.)-এর কাছে এসে দ

৩,নারীর ফরজ ইলম

. কোন ধরনের জ্ঞান নারীর জন্য ফরজ:

ইসলামী স্কলারদের মতে নারীর জন্য দুই ধরনের জ্ঞান ফরজ:

১,ফরজে আইন:

২,ফরজে কেফায়া

*১, ফরজে আইন : যে কাজ করা প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য আবশ্যক। দ্বীনি জ্ঞান অর্জন ,আকিদা, তাওহীদ, নামাজ, রোজা, পর্দা, হাল-হারাম সম্পর্কে জ্ঞান। যেটা ছাড়া সে তার ইবাদত ও জীবন পরিচালনা করতে পারবে না আর যার মাধ্যমে আল্লাহ ও বান্দার সম্পর্ক মজবুত হয়,তাও অর্জন করা প্রত্যেকের ওপর ফরজ।

-২, বলছে কিফায়া: যে কাজ করা প্রত্যেকের উপর আবশ্যক নয়।তবে অর্জন করা কাম্য। অর্থ্যাৎ যেসব জ্ঞান ব্যতীত দুনিয়াবি জীবনে সাবলীলভাবে চলা যায় না।প্রয়োজনীয় দুনিয়াবি জ্ঞান,সন্তান প্রতিপালন, ঘর সংসার পরিচালনা, স্বাস্থ্য ও নৈতিকতার সাথে সম্পর্কিত জ্ঞান।

আর উচ্চতর জ্ঞান যেমন ডাক্তারি, শিক্ষকতা, ইসলামী ফিকহ - এগুলো *ফরজে কিফায়া*। অর্থাৎ সমাজের কিছু নারী যদি এই জ্ঞান অর্জন করে তবে বাকিদের উপর থেকে দায়িত্ব সরে যায়।
সূরা আত-তাহরীম, আয়াত ৬

আরবি:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

বাংলা অর্থ:
"হে মুমিনগণ, তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনকে সেই আগুন থেকে রক্ষা কর, যার ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর। যাতে নিয়োজিত আছে পাষাণ হৃদয়, কঠোর স্বভাবের ফেরেশতাগণ। তারা আল্লাহ যা আদেশ করেন, তা অমান্য করে না এবং যা করতে আদেশ করা হয়, তাই করে।"
- সূরা আত-তাহরীম: ৬
অতএব জাহান্নাম থেকে নিজেদেরকে ও পরিবারের লোকজনকে বাঁচাতে হলে নারী কিংবা পুরুষের হালাল - হারাম জ্ঞান অর্জনের বিকল্প নেই।

৪,ধর্মীয় জ্ঞানের আবশ্যকতা:

একজন মুসলমানের ধর্মীয় জ্ঞান না থাকলে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তাকে চ্যালেঞ্জ ও সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়।এটা শুধু আখেরাতে নয় দুনিয়ায় ও ক্ষতির মুখে পড়তে হয়।

একজন মা তার পরিবারের বিদ্যালয়। মা - বাবা উভয়ের কাছ থেকে সন্তান শিক্ষা পায়।তবে,বাবার যেহেতু কর্মক্ষেত্রে দায়িত্ব থাকে তাই বাবারা সন্তান কে পর্যাপ্ত সময় দিতে পারে না। দায়িত্ব সব মায়ের উপর এসে পরে । তাই একজন নারী যদি ধর্মীয় শিক্ষায় শিক্ষিত না হয় ।তাহলে আমাদের পরবর্তী প্রজন্ম ধংসের দাঁড়প্রান্তে দাঁড়াবে।

ধর্মীয় জ্ঞান না থাকলে একজন মুসলমান যেসব সমস্যা মোকাবেলা করে*

১,আকিদা ও ঈমানের ক্ষেত্রে*

- *শিরক ও বিদআতে পড়ে যাওয়া*: সঠিক জ্ঞান না থাকলে মানুষ অজান্তেই শিরক, কুসংস্কার বা বিদআতি আমলে লিপ্ত হয়ে পড়ে।
- *ঈমান দুর্বল হয়ে যাওয়া*: আল্লাহ, রাসূল, আখিরাত সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা না থাকলে ঈমান অটল থাকে না। সামান্য পরীক্ষাতেই সে দোদুল্যমান হয়ে পড়ে।
- *সন্দেহ ও বিভ্রান্তি*: বিভিন্ন মতবাদ, নাস্তিকতা বা পাশ্চাত্য দর্শনের প্রভাবে সে নিজের দ্বীন নিয়ে সন্দেহে ভোগে।

২ ,ইবাদতের ক্ষেত্রে*
- *ভুলভাবে ইবাদত করা*: নামাজ, রোজা, যাকাত, হজ্জ - কোনোটাই শুদ্ধভাবে আদায় করতে পারে না। কারণ নিয়ম-কানুন ও শুদ্ধতা সম্পর্কে জানে না।
- *ইবাদতের রুহ হারিয়ে ফেলা*: শুধু লোক দেখানো ইবাদত করে, কিন্তু তাকওয়া ও খুশু-খুজু তৈরি হয় না।

৩. আখলাক ও চরিত্রের ক্ষেত্রে*
- *নৈতিক অবক্ষয়*: সত্য বলা, আমানতদারি, বিনয়, ধৈর্য - ইসলামের মৌলিক আখলাকগুলো চর্চা করতে পারে না।
- *হারাম-হালের পার্থক্য না বোঝা*: সুদ, ঘুষ, গীবত, মিথ্যা - এগুলোকে সাধারণ বিষয় মনে করে জড়িয়ে পড়ে।
- *আত্মনিয়ন্ত্রণের অভাব*: রাগ, হিংসা, অহংকার নিয়ন্ত্রণ করতে না পেরে সম্পর্ক নষ্ট করে ফেলে।

৪. পারিবারিক জীবনে*
- *সন্তান প্রতিপালনে ব্যর্থতা*: সন্তানকে ইসলামী আদর্শে গড়ে তুলতে পারে না। ফলে সন্তান বিপথগামী হয়ে যায়।

- *স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের টানাপোড়েন*: ইসলামের অধিকার ও দায়িত্ব সম্পর্কে না জানায় ছোটখাটো বিষয়ে ঝগড়া বেড়ে যায়।
- *পরিবারে বরকতের অভাব*: দ্বীনি পরিবেশ না থাকায় ঘরে অশান্তি, কলহ আর অস্থিরতা লেগেই থাকে।

৫. সামাজিক ও নৈতিক জীবনে*
- *ভুল সিদ্ধান্ত নেওয়া*: ব্যবসা, চাকরি, বিবাহসহ জীবনের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে শরিয়াহর দিকনির্দেশনা না পাওয়ায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়।
- *সমাজে বিভ্রান্তির শিকার হওয়া*: কেউ ভুল কথা বললেও যাচাই করতে পারে না। ফলে সহজেই প্রতারিত হয়।
- *মুসলিম পরিচয় হারিয়ে ফেলা*: ধীরে ধীরে ইসলামী সংস্কৃতি থেকে দূরে সরে গিয়ে পাশ্চাত্য সংস্কৃতি ও জীবনধারা গ্রহণ করে।

৬. আখিরাতের ক্ষেত্রে*

- আল্লাহ তায়ালা কুরআনে বলেছেন: *সূরা ত্বা-হা, আয়াত ১২৪*

আরবি:

وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ

"যে ব্যক্তি আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তার জন্য রয়েছে সংকীর্ণ জীবন এবং কিয়ামতের দিন আমি তাকে অন্ধ অবস্থায় উত্থিত করব"

- জ্ঞান না থাকার কারণে গুনাহ করে ফেললেও সে তাওবা করতে পারে না। ফলে আখিরাতে জবাবদিহির মুখোমুখি হতে হয়।

মূল কথা
ধর্মীয় জ্ঞান হলো একজন মুসলমানের জন্য আলোর মতো। জ্ঞান না থাকলে সে অন্ধকারে হাঁটে। তখন শয়তান সহজেই তাকে ধোঁকা দেয়, আর সে নিজেও বুঝতে পারে না।
রাসূল (সা.) বলেছেন: _"আলেমরা হলেন নবীদের উত্তরাধিকারী।

৬, একজন আদর্শ নারীর গুণাবলী:

একজন আদর্শ নারীর গুণাবলী নীরব আলোর মতো, যা ঘরকে আলোকিত করে আর হৃদয়কে প্রশান্তি দেয়।

তিনি প্রথমত আল্লাহভীরু হন। নামাজ, পর্দা, যিকির আর তাকওয়ার মাধ্যমে তার জীবন গড়ে ওঠে। এই ভয় আর ভালোবাসা তাকে গুনাহ থেকে বাঁচায় এবং ঘরকে বরকতের জায়গায় পরিণত করে।

তিনি স্বামীর প্রতি অনুগত ও মমতাময়ী হন। কঠিন সময়ে ধৈর্য ধরেন, মিষ্টি কথায় মন জুড়ান, আর সম্মান দিয়ে সম্পর্ককে মজবুত রাখেন। স্বামীর অনুপস্থিতিতে তার সম্মান, সম্পদ আর ঘরের আমানত রক্ষা করেন।

তিনি সন্তানের প্রথম মাদরাসা। আদব, সততা, লজ্জাশীলতা আর দ্বীনের ভালোবাসা নিজে আমল করে সন্তানের অন্তরে বপন করেন। তার কথায়-কাজে সন্তান শেখে কীভাবে একজন ভালো মুসলিম হতে হয়।

তিনি লজ্জাশীল, নম্রভাষী আর ধৈর্যশীলা। কর্কশ না হয়ে নম্র ভাষায় কথা বলেন। অহেতুক কথায় জড়ান না, রাগকে দমন করেন, অন্যের দোষ ঢেকে রাখেন। তার উপস্থিতিই ঘরে শান্তির আবহ তৈরি করে।

সবচেয়ে বড় কথা, তিনি দুনিয়ার সৌন্দর্য নয়, আখিরাতের সফলতাকে লক্ষ্য বান। ঘরের কাজ, সন্তান লালন, স্বামীর সেবা—সবই ইবাদতের নিয়তে করেন।
ইলম অর্জন এবং দাওয়াহ এর প্রতি আগ্রহ থাকবে তিনি নিজে শিখবে পরিবারকে শেখাবে। আয়েশা (র),ফাতেমা(র),প্রমুখ সাহাবিরা ইলম ও তালিমের বড় উদাহরণ।

এমন নারীই হলো দুনিয়ার সর্বোত্তম সম্পদ, যার কথা রাসূল ﷺ বলেছেন: "দুনিয়া হলো উপভোগের বস্তু, আর দুনিয়ার সর্বোত্তম উপভোগ্য হলো নেককার স্ত্রী।"

২য় অধ্যায়: পরিবার

১,বিয়ের আগে বোনেদের মানসিক প্রস্তুতি

বিয়ের আগে মেয়েদের মানসিক প্রস্তুতিটা কিন্তু সবচেয়ে বেশি। কারণ, পুরুষ যত টাকা আয় করুক না কেন, ঘর কিন্তু সামলে রাখেন ঘরের মেয়েরাই। পুরুষরা হলেন ঘরের ড্রাইভারের মতো, আর মেয়েরা হলেন সেই ঘরের ইঞ্জিন। ইঞ্জিন ছাড়া যেমন গাড়ি চলবে না, ড্রাইভার ছাড়াও গাড়ি চলা অসম্ভব।

তাদের সবচেয়ে বড় মানসিক প্রস্তুতি হলো, এত বছরের চেনা পরিবেশ আর নিজ পরিবারকে দূরে রেখে নতুন এক পরিবেশে গিয়ে নতুন পরিবারকে আপন করে নেয়ার মানসিক প্রস্তুতি। তাদেরকেই এখন থেকে জীবনের সুখ-দুঃখের অংশীদার বানিয়ে নেয়ার প্রস্তুতি।

মেয়েরা স্বাভাবিকভাবেই বাসার সবচেয়ে আদুরে হয়ে থাকে। তাদের আবদারও থাকে বেশি। আবার কেউ কেউ বড্ড অভিমানীও হয়। কিন্তু বিয়ের পর এই মেয়েকেই অনেক আবদার পরিস্থিতি বুঝে মনের মধ্যেই চেপে যেতে হয়।

আগে হয়তো নিজের বাসায় এঁ-টো বাসনগুলোও ধরতে ঘে-ন্না হতো, এখন তাকে এসব তো পরিষ্কার করতে হবেই, ক'দিন বাদে সন্তানের মল-মূত্রও নিজহাতে সাফাই করতে হবে। অথচ বিয়ের আগে এর মানসিক প্রস্তুতি না-থাকার কারণে অনেক মেয়েই শ্বশুরবাড়ি এসে ভেঙে পড়ে। মন খারাপ করে বসে থাকে। সবাই এমন তা নয়, অনেকেই ছোট থেকে ঘরের সব কাজ করা শিখে নেয়; তাদের জন্য বিয়ের পর সবকিছু মানিয়ে নেয়া অনেকটাই সহজ হয়ে যায়।

আবার অনেকের অভ্যাস হলো সকালে আটটার আগে ঘুম না ভাঙা। আটটার পর মা এসে টেনেটুনে ঘুম ভাঙান। এ নিয়ে বাসায় প্রতিদিন বকাঝকা শুনতে শুনতে ক্লান্ত। কিন্তু বিয়ের পর এমন হলে চলবে না বোন, এখন ফজরের পর উনুনের আগুনটা প্রথমে আপনাকেই ধরাতে হবে। আগে হয়তো বাসায় বু-য়া এসে কাপড়চোপড় ধুয়ে

দিতেন। শ্বশুরবাড়ি তো বু-য়া নাও থাকতে পারে, তখন নিজের কাপড়, স্বামীর কাপড়, প্রয়োজনে খেদমতের নিয়তে শ্বশুর-শাশুড়ির কাপড়ও ধুয়ে দিতে হবে।

বিয়ের পরে মেয়েদের সবচেয়ে বেশি যে জিনিসটি সহ্য করতে হয় তা হলো, শ্বশুরবাড়ির বিভিন্ন আত্মীয়দের ক-টু-ক-থা। বাবার বাড়ি থেকে কী দিল? কে কে দেখতে আসল? রান্না এমন কেন? শরীর এত শুকনো কেন? মাথায় চুল কম কেন? বাবার বাড়ি এত যাওয়া লাগে না কি, বছরে একবার গেলেই তো হয়! — এসব নানারকম কথা শুনতে হয় মুখ বুজে।

বাবার বাড়ির রাজকন্যা এখানে এসে হয়ে যায় ঘরের বউ। পার্থক্য এটাই যে, বাবার বাড়িতে তার মন জুগিয়ে চলতে হতো সবার। তার অভিমানের কাছে যেন রাজ্যের ক্ষমতাও নস্যি। কোনো কিছু চাওয়ার আগেই যেন তার সামনে তা হাজির করার জন্য সবাই ব্যতিব্যস্ত হয়ে যেত। অথচ এখন এখানে তাকে চলতে হবে সবার মন জুগিয়ে। এখানে অভিমানগুলো সব আঁচলেই মুছে যায়। কত আবদার হারিয়ে যায় স্বামীর সামর্থ্য না থাকার কারণে। এসব মেনে চলার জন্য বিয়ের আগেই মানসিক প্রস্তুতি দরকার।

[বই : বিয়ের আগে ফ্যান্টাসি নয়, হোক বাস্তব প্রস্তুতি]

১, বিবাহ:*

উম্মাহর প্রথম ইউনিট হলো পরিবার। মুসলিম উম্মাহ যদি একটি ইমারত হয় তবে তার ভীত হলো পরিবার। একটি শিশুর নিরাপদ আশ্রয়স্থল তার পরিবার। শিশু তার জন্মের পর মায়ের যত্নে বাবার রক্ষণাবেক্ষণে লালিত পালিত হয়। পরিবার ই শিশুর প্রথম পাঠশালা, মায়ের হাতেই সন্তানের শিক্ষার হাতেখড়ি। পরিবারের সূচনা হয় নারী-পুরুষের বৈবাহিক বন্ধনের মাধ্যমে। বিয়ে হচ্ছে পরিবার গড়ার প্রথম ধাপ। এ বিষয়ে আল্লাহ তায়ালা কুরআনে বলেন :
An-Nisa' 4:1

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً

হে মানুষ, তোমরা তোমাদের রবকে ভয় কর, যিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এক নফস থেকে। আর তা থেকে সৃষ্টি করেছেন তার স্ত্রীকে এবং তাদের থেকে ছড়িয়ে দিয়েছেন বহু পুরুষ ও নারী।

বিয়ের বন্ধন জান্নাতের বন্ধন: যেহেতু আদম(আ) ও হাওয়া(আর) এর বিয়ে জান্নাতের হয়েছিল। সমস্ত নবীদের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য এর মধ্যে একটা প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো বিয়ে।।বিয়ের গুরুত্ব সম্পর্কে কুরআন ও হাদিসে অনেক জায়গায় উল্লেখ করা আছে।

কোরআনে বিয়ে সম্পর্কে:*সূরা আর-রূম, আয়াত ২১*

আরবি:
وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

বাংলা অর্থ:
"আর তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের নিজেদের মধ্য থেকে সঙ্গিনীদের সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাদের কাছে প্রশান্তি লাভ কর। আর তিনি তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক ভালবাসা ও দয়া সৃষ্টি করেছেন। নিশ্চয় এর মধ্যে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শন রয়েছে।"
- সূরা আর-রূম: ২১

এই আয়াত বিয়ের মূল উদ্দেশ্য বোঝায়: *সাকিনাহ* - প্রশান্তি, *মাওয়াদ্দাহ* - ভালোবাসা, আর *রহমাহ* - দয়া।

সূরা আল-বাকারা, আয়াত ১৮৭

আরবি:

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ ۚ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ ۗ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ ۖ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۖ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ۚ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ۗ

বাংলা অর্থ:

"রোজার রাতে তোমাদের স্ত্রীদের সাথে সহবাস করা তোমাদের জন্য হালাল করা হয়েছে। তারা তোমাদের পোশাক এবং তোমরা তাদের পোশাক। আল্লাহ জানেন যে, তোমরা নিজেদের সাথে খিয়ানত করছিলে, অতঃপর তিনি তোমাদের তাওবা কবুল করেছেন এবং তোমাদেরকে ক্ষমা করেছেন। সুতরাং এখন তোমরা তাদের সাথে সহবাস কর এবং আল্লাহ তোমাদের জন্য যা নির্ধারণ করেছেন, তা কামনা কর। আর পানাহার কর যতক্ষণ না ফজরের সাদা রেখা কালো রেখা থেকে স্পষ্ট হয়। অতঃপর রাত পর্যন্ত সিয়াম পূর্ণ কর। আর তোমরা মসজিদে ইতিকাফরত অবস্থায় তাদের সাথে সহবাস করো না। এগুলো আল্লাহর সীমারেখা, সুতরাং এর নিকটবর্তী হয়ো না। এভাবেই আল্লাহ মানুষের জন্য তাঁর আয়াতসমূহ স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন, যাতে তারা তাকওয়া অবলম্বন করে।"

- সূরা আল-বাকারা: ১৮৭

মূল পয়েন্ট: এই আয়াতে স্বামী-স্ত্রীকে একে অপরের *"লিবাস"* - পোশাক বলা হয়েছে। পোশাক যেমন লজ্জা ঢাকে, সৌন্দর্য বাড়ায়, শীত-গরম থেকে বাঁচায় - স্বামী-স্ত্রীও তেমনি একে অপরের দোষ গোপন করে, প্রশান্তি দেয় ও রক্ষা করে।

বিয়ের কিছু সুন্নাত:

১, বিয়েতে যথাসম্ভব খরচে সীমিত রাখতে হবে।যেই বিয়েতে খরচ কম সেই বিয়ে সবচেয়ে উত্তম।

বিয়েকে অপচয়,অপব্যয়,বেপর্দা ও বিজাতীয় সংস্কৃতি এবং যৌতুক ইত্যাদি থেকে মুক্ত রাখতে হবে।

২, দেনমোহর নগদ হওয়া চাই। দেনমোহর বেশি দেওয়া কখনোই মেয়ের নিরাপত্তার গ্যারান্টি হতে পারে না।ছেলের সামর্থ্য অনুযায়ী যতটুকু নগদ দিত পারে ততটুকুই দেনমোহর হওয়া উচিত।(সুনানে আবু দাউদ:২১০৬)

৩,পাত্রের জন্য পাত্রী দেখে নেওয়া মুস্তাহাব। কিন্তু আনুষ্ঠানিক ঘটা করে পাত্রী দেখানোর নামে যে বেপর্দা প্রথা আমাদের সমাজে প্রচলিত আছে এগুলো সুন্নাতে পরিপন্থী ও পরিতাজ্য।(সহীহ বুখারী , শামেলা-৫০৯০, ইমদাদুল ফাতাওয়া-৪/২০০) পাত্রীর কোন ছবি পাত্র পক্ষকে দেওয়া শরিয়তসম্মত নয় বলেই অধিকাংশ আলেম মতামত দিয়েছেন।কারন বিয়ের পাত্রীর ছবি ছেলে ছাড়াও অন্য গায়রে মাহরাম দেখার আশংকা আছে। অন্যদিকে অযথা পাত্রের ছবি ও চাওয়া যাবে না।

৪,জুমার দিন মসজিদে বিবাহ করা সুন্নাত।

৫, বিবাহের অনুষ্ঠান বলতে একটিই অনুষ্ঠান হবে সেটি হবে ওয়ালিমা। লাইলাতুল হায়াত(প্রথম রাত)পর ওয়ালিমা করা সুন্নাত।ওয়ালিমা ছেলে পক্ষ থেকে হতে হবে।
৬. কনের পক্ষ থেকে কোনো ধরনের শর্ত করা নিষেধ, তবে মোহর অবশ্যই চাইতে হবে। কেননা এটা মেয়ের হক। অন্যদিকে, ছেলের পক্ষ থেকে যৌতুক চাওয়া ও সুস্পষ্টভাবে হারাম। (আহসানুল ফাতাওয়া-৫/১৩)

৭. বিয়ে পড়ানোর সময় কনের অনুমতি নিতে গিয়ে সাক্ষী রাখার কোনো প্রয়োজন নাই। আর বিয়েতে যতক্ষণ পর্যন্ত মেয়ের কোনো মাহরাম উপস্থিত থাকে (যেমন: বাবা, ভাই) ততক্ষণ পর্যন্ত, মাহরাম নয় এমন কাউকে উকিল বানিয়ে মেয়ের কাছে ইজাব/কবুল শোনার জন্য যাওয়া শরীয়তসম্মত নয়। অন্যদিকে ইসলামে উকিল বাপ বলে কিছু নেই। উকিল বাপ বিষয়ক যত প্রথা রয়েছে, যেখানে উকিল বাপকে আপন বাবার মতো মাহরাম মনে করা হয়, এগুলো সম্পূর্ণ বিদআত ও হারাম। (আল-ফিকহুল ইসলামি ওয়া আদিল্লাতুহ: ৯/২৭২৬, কিতাবুল নাওয়াযিল: ৮/১৩৯)
অন্যদিকে ঢালাওভাবে ছেলের পক্ষের লোক ইজাব/কবুল শুনতে যাওয়া অনর্থক এবং বেপর্দাহিনতা। তাই আমাদের সকলকে এমন ঘৃণিত পাপ কাজ থেকে বেঁচে থাকা অপরিহার্য। (সহীহ মুসলিম, শামেলা: ১৪২১)

৮. শর্তারোপ করে বরযাত্রীর নামে বরের সাথে অধিক সংখ্যক লোকজন নিয়ে যাওয়া এবং কনের বাড়িতে মেহমান হয়ে কনের পিতার উপর বোঝা সৃষ্টি করা আজকের সমাজের একটি জঘন্য কুপ্রথা, যা অবশ্যই পরিত্যাজ্য। (মুসনাদে আহমাদ : ২০৭২২, সহীহ বুখারী: ২৬৯৭)

বিয়ের নামে প্রচলিত বিদআত

আমাদের বিবাহগুলোতে অনেক অনিয়ম বা কুপ্রথা চালু রয়েছে যা ইসলামি শরীয়াহ সমর্থন করে না। বরং ঐসব কাজ ইসলামি দৃষ্টিকোণ থেকে খুবই নিন্দনীয়। অনেক সময় দেখা যায় একটা পরিবারে এক যুগে যে পরিমাণ গুনাহ হয় না, একটা বিবাহ অনুষ্ঠানে তার চেয়ে বেশি গুনাহের কাজ হয়ে থাকে। বিয়ের দিন সবাইকে খুশি করা হয়। বাবুর্চি থেকে শুরু করে একজন ভিক্ষুককেও বিয়ের দিন বখশিশ দেওয়া হয়, খুশি করা হয়। আর সবচেয়ে অখুশি করা হয়, আমাদের মালিক আল্লাহকে, বহুবিধ গুনাহের দ্বারা। আমাদের মুসলমানদের বিয়েতে যেসব অনিয়ম বা প্রথা রয়েছে সেগুলোর মধ্য থেকে কিছু বিষয় নিয়ে আমরা আমাদের অভিজ্ঞতা থেকে আলোচনা করছি যা আমাদের উপকারে আসতে পারে।

১. পাত্রী দেখা:
আমাদের সমাজে পাত্রী বা মেয়েকে দেখার যে নিয়ম চালু রয়েছে তা সঠিক নয়। পাত্রীকে দেখতে গেলে ইসলামি নিয়ম মানা হয় না। যিনি বিয়ে করবেন, তার সাথে অনেক পুরুষ লোক দেখতে যান যাদের সাথে দেখা দেওয়া জায়েয না।

২,গায়ে হলুদ:
গায়ে হলুদকে কেন্দ্র করে অনেক আয়োজন, অনুষ্ঠান,গান- বাজনা ও বেপর্দা মেলামেশা আমাদের সমাজে হয়।অথচ ইসলামি শরিয়তে গায়ে হলুদের কোন নিয়ম নেই বরং এটা বিদআত।

৩,অত্যাধিক জৌলুস ও আড়ম্বর:
বিয়েশাদীতে বর্তমানে জাঁকজমকপূর্ণ ও আড়ম্বর বেশী করা হয় । বেশী আড়ম্বরপূর্ণ বিয়ে ইসলাম সমর্থন করে না। অনাড়ম্বর বিয়েটাই বেশি বরকতপূর্ণ।

৪, বিয়েশাদীতে বেপর্দার সয়লাব:
শরিয়তের হুকুম অমান্য করে ,জাহৈলি কুপ্রথা চালু করা হয়েছে বর্তমান সময়ের বিয়েতে।বেপর্দা নারী পুরুষের অবাধ বিচরণ হয় যা ইসলাম সমর্থন করে না।খাওয়া-দাওয়া; ঘটা করে পর-পুরুষের বউ দেখা। সেগুলো ভিডিও করে অন্য মানুষকে দেখানো। এসকল রীতিনীতি সবই গর্হিত কাজ, যা ইসলাম সমর্থন করে না।

৫. যৌতুক নেয়া:
যৌতুক নেওয়া একটা জঘন্যতম কাজ। কিন্তু আজকাল বিয়েতে এসব বিষয় মানা হয় না। লক্ষ লক্ষ টাকা যৌতুক ধার্য হচ্ছে বিয়েতে। বিভিন্ন আসবাবপত্রের জোর দাবি করা হচ্ছে। এভাবে মেয়ে পক্ষ থেকে জোর-জুলুম করে যৌতুক নেওয়া হয়। অথচ ইসলামি শরীয়তে যৌতুক বলে কিছু নেই। তবে বিয়েতে কনের বাবা বা আত্মীয়-স্বজনেরা বরকে বা কনেকে উপহার হিসেবে অনেক কিছুই দিতে পারবেন এবং বর-কনেও তা গ্রহণ করতে পারবে।
৬. বিয়েতে গান-বাজনা:
বিয়েশাদির মতো পবিত্র অনুষ্ঠানে গান-বাজনার সমালোচনা। বিভিন্ন ধরনের গান-বাজনার আসর বসে আজকাল বিয়েতে। একটা পবিত্র মজলিসকে কলুষিত করা হচ্ছে। গান-বাজনা দ্বারা বিয়ের অনুষ্ঠান কখনোই ইসলামি শরীয়তে ছিল না। বরং এটা হারাম ও বিদআত।

৭. উকিল পিতা বানানো
বিয়েতে উকিল বাপ, পিতা বর্তমান থাকার পরও অন্যকে বানানো হয় যা শরীয়তসম্মত নয়। শরীয়তের নিয়ম হলো, উকিল বাপ হবে মেয়ের বাবা নিজেই বা অভিভাবকদের মধ্যে থেকে কোনো মাহরাম ব্যক্তি যার সাথে দেখা দেওয়া জায়েয আছে। ইসলামি বিয়েতে মেয়ের আইনগত অভিভাবকের অনুমতি অবশ্যই প্রয়োজন। যেসব মেয়ের বাবা বর্তমান আছেন তাদের বাবাই অভিভাবক, আরবীতে যাকে উকিল বলে। বাবার

অবর্তমানে যিনি মেয়ের আইনগত অভিভাবক তিনি হলেন মেয়ের চাচা, মামা ইত্যাদি যিনি মেয়ের উকিলের দায়িত্ব পালন করবেন। আইনগত অভিভাবক ছাড়া তৃতীয় কোনো ব্যক্তিকে উকিল বানানো যাবে না।

৮. খাদ্যের অপচয়:
কিছু মানুষ বিয়ের অনুষ্ঠানে খাদ্যের অপচয় ঘটায়। প্রচুর পরিমাণ খাবার নষ্ট হয়। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এর ঘোষণা,
"নিশ্চয় অপচয়কারী শয়তানের ভাই। আর শয়তান হচ্ছে তার প্রভুর প্রতি বড় অকৃতজ্ঞ"। (বনি ইসরাইল: আয়াত ২৭)

৯. ছেলের হাতে সোনার আংটি:
বিয়ের অনুষ্ঠানে বরের হাতে সোনার আংটি না পরালে মানসম্মান থাকে না, অথচ পুরুষদের জন্য সোনা ব্যবহার করা হারাম।

১০. মোহরানা:
আমাদের দেশে স্বামী মোহরানা না দিয়ে বাসর রাতে স্ত্রীর নিকট ক্ষমা চায়। অথচ ইসলামি বিধানমতে, স্ত্রীরা মোহরানার হকদার যা অবশ্যই প্রদান করতে হবে। আমার অন্যদিকে কনেপক্ষও ছেলের সামর্থ্যের বাইরে মোহর ধার্য করে যেটা শরীয়ত সম্মত নয়।

১১. বিয়ের গোসল:
আমাদের দেশে গ্রামাঞ্চলে বরকে বিয়ের গোসল দেয় ভাবীরা, যা গুনাহের কাজ এবং নিষিদ্ধ।

১২. হাত ধোয়া:
বিয়েতে গায়রে মাহরাম অথবা ছেলের শ্যালিকারা হাত ধুয়ে দেয় যা শরীয়তসম্মত নয়। শ্যালিকার সাথে দেখা দেওয়া, জরুরি প্রয়োজন ব্যতীত কথা বলা জায়েয নেই।
১৩. নির্দিষ্ট দিন-তারিখ দেখে বিয়ে করা:

চান্দ্রবর্ষের কোনো মাসে বা কোনো দিনে অথবা বর/কনের জন্ম তারিখে বা তাদের পূর্বপুরুষের মৃত্যুর তারিখে বিয়ে-শাদী হওয়া যাবে না- এরূপ চিন্তাভাবনা করা ইসলাম সমর্থন করে না।

*১৪. হিন্দুয়ানী প্রথা:

অনেক এলাকায় মুসলমানের বিয়েতে বাঁশের কুলায় চন্দন, মেহেদি, হলুদ, কিছু ধান-দূর্বা ঘাস, কিছু কলা, সিঁদুর ও মাটির চাটি নেওয়া হয়। মাটির চাটিতে তেল নিয়ে আগুন জ্বালানো হয়। স্ত্রী ও বরের কপালে তিনবার হলুদ লাগায় এমনকি মূর্তিপূজার ন্যায় কুলাতে রাখা আগুন জ্বালানো চাটি বর-কনের মুখের সামনে ধরা হয় ও আগুনের ধোঁয়া ও কুলা হেলিয়ে-দুলিয়ে বাতাস দেয়া হয়। এসব হিন্দুয়ানী প্রথা ও অনৈসলামিক কাজ। অনেক সময় শিরকের পর্যায়ে চলে যায়।

১৫.কদমবুচি করা:

বর ও কনের মুরব্বিদের কদমবুসি করা একটি মারাত্মক কুপ্রথা। বিয়েতে তো নয়ই এমনকি যে কোনো সময়, পায়ে হাত দিয়ে সালাম করা রাসূল ﷺ ও তাঁর সাহাবীদের (রাযিয়াল্লাহু আনহুম) দ্বারা প্রমাণিত নয়। কদমবুসি করার সময় সালাতের রুকু-সিজদার মতো অবস্থা হয়। বেশি সম্মান প্রদর্শন করতে গিয়ে হিন্দুয়ানী প্রথামকে প্রথা হিসেবে নিয়ে আসা মুমিনদের বৈশিষ্ট্য নয়।

১৬. বরের হাতে মেহেদি পরা:

পুরুষ সাজসজ্জার উদ্দেশে হাতে-পায়ে-নখে মেহেদি ব্যবহার করতে পারবে না। কারণ মেহেদি এক ধরনের রং। আর শরীয়ত অনুযায়ী পুরুষের জন্য রং ব্যবহার করা নিষিদ্ধ। হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, পুরুষের সুগন্ধি এমন হবে, যার ঘ্রাণ প্রকাশ পায় এবং রং গোপন থাকে। আর নারীর সুগন্ধি এমন হবে, যার রং প্রকাশ পায় কিন্তু ঘ্রাণ গোপন থাকে। (সুনানে তিরমিজি, হাদীস নং : ২৭৮৭)

১৭. এনগেজমেন্ট অনুষ্ঠান ও বিয়ের আগে পাত্রীকে মাহরাম ভাবা:
আমাদের সমাজে প্রচলিত এনগেজমেন্ট অনুষ্ঠান ইসলাম সমর্থিত না। ইসলামে এর কোনো নজির নেই। মূলত এটা বিধর্মীদের রীতি। এনগেজমেন্টকে কেন্দ্র করে সাধারণত যে কাজ হয়ে থাকে তা ইসলামে নিষিদ্ধ।

২,বহুবিবাহ সম্পর্কে ইসলাম কী বলে - কুরআন ও হাদিসের আলোকে*

বহুবিবাহ প্রসঙ্গ

একজন পুরুষ একাধিক নারীকে বিয়ে করাকে বলা হয় বহুবিবাহ। আধুনিক যুগে ইসলামের বিরুদ্ধে উত্থাপিত প্রধান আপত্তিগুলোর একটি এই যে, ইসলাম পুরুষকে এক থেকে চারটি নারী বিয়ে করার অনুমতি দেয়। তারা বলে, 'প্রাকৃতিকভাবে মানুষের একটি বিয়েরই প্রয়োজন। সুতরাং বহুবিবাহ প্রকৃতিবিরোধী। তা ছাড়া এটা নারীর প্রতিও একটি অবিচার। কেননা একজন স্ত্রী থাকাবস্থায় আরেকজন স্ত্রী আসা এবং সারাজীবনের জন্য তার প্রতিপক্ষ হয়ে তাকে কষ্ট দেওয়া, এটা অবশ্যই স্পষ্ট অবিচার ও জুলুম'।

এই 'স্পষ্ট অবিচার ও জুলুম'কে প্রতিহত করার জন্য অনেক দেশে আইনত শুধু এক স্ত্রী রাখার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। অনেক দেশে আইনত বহুবিবাহ নিষিদ্ধ না হলেও সামাজিক ও নৈতিকভাবে মন্দ বলে বিবেচিত হয়। অন্যদিকে আরব দেশগুলোতে বহুবিবাহের ওপর আইনত কোনো নিষেধাজ্ঞা নেই এবং সামাজিক ও নৈতিকভাবে তাকে খারাপ চোখেও দেখা হয় না।

ইসলামে বহুবিবাহ শর্তসাপেক্ষে বৈধ। এটি ফরজ বা ওয়াজিব নয়, বরং একটি অনুমতি যা কঠিন শর্তের সাথে বাঁধা।

১. কুরআনের দলিল

সূরা আন-নিসা, আয়াত ৩:
وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

অর্থ:
"আর যদি তোমরা আশঙ্কা কর যে, ইয়াতীম মেয়েদের প্রতি সুবিচার করতে পারবে না, তবে নারীদের মধ্য থেকে যাদেরকে তোমাদের পছন্দ হয় বিয়ে কর - দুই, তিন অথবা চারটি পর্যন্ত। আর যদি আশঙ্কা কর যে, সুবিচার করতে পারবে না, তবে একজনকেই অথবা তোমাদের অধিকারভুক্ত দাসীকেই গ্রহণ কর। এটাই পক্ষপাতিত্ব না করার অধিকতর নিকটবর্তী।"

সূরা আন-নিসা, আয়াত ১২৯:
وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۖ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ۚ

অর্থ:
"আর তোমরা যতই আগ্রহ রাখ না কেন, তোমরা কখনও স্ত্রীদের মধ্যে পূর্ণ সমতা রক্ষা করতে পারবে না। সুতরাং তোমরা কোনো একজনের দিকে সম্পূর্ণভাবে ঝুঁকে পড়ো না যে, অপরকে ঝুলন্ত অবস্থায় রেখে দেবে।"

২. হাদিসের দলিল

সহীহ বুখারী, হাদিস: ৫০৬৫
রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: "যে ব্যক্তির দুই স্ত্রী আছে এবং সে তাদের মধ্যে একজনের দিকে ঝুঁকে পড়ে, কিয়ামতের দিন সে একপাশ কাত হয়ে উপস্থিত হবে।"

সুনানে আবু দাউদ, হাদিস: ২১৩৩

গায়লান ইবনে সালামা সাকাফী যখন ইসলাম গ্রহণ করেন, তখন তাঁর ১০ জন স্ত্রী ছিল। নবী ﷺ তাকে বললেন: "তাদের মধ্য থেকে চারজনকে রেখে দাও এবং বাকিদের তালাক দাও।"

৩. মূল শর্ত ও নীতিমালা
বিষয় ব্যাখ্যা
সর্বোচ্চ সংখ্যা একসাথে সর্বোচ্চ ৪ জন স্ত্রী রাখা যাবে। এর বেশি হারাম।
সবচেয়ে বড় শর্ত: ইনসাফ স্ত্রীদের মধ্যে ভরণপোষণ, রাত্রিযাপন, সময় ও ব্যবহারে পূর্ণ সমতা করতে হবে। মনের ভালোবাসায় সমতা অসম্ভব, তাই সেটা ক্ষমার যোগ্য। কিন্তু বাহ্যিক আচরণে বৈষম্য করা কবিরা গুনাহ।
সামর্থ্য দৈহিক, আর্থিক ও মানসিক সামর্থ্য থাকতে হবে। স্ত্রীদের হক আদায় করতে না পারলে বহুবিবাহ জায়েয নেই।
প্রথম স্ত্রীর অনুমতি ইসলামে প্রথম স্ত্রীর অনুমতি বাধ্যতামূলক নয়। তবে স্ত্রীকে না জানিয়ে বিয়ে করা প্রতারণা এবং পারিবারিক অশান্তির কারণ। বাংলাদেশের আইনে প্রথম স্ত্রীর লিখিত অনুমতি লাগে।
৪. কেন ইসলাম বহুবিবাহের অনুমতি দিল?

ইসলাম বহুবিবাহকে উৎসাহিত করেনি, বরং নিয়ন্ত্রণ করেছে। জাহেলি যুগে ১০-২০টা পর্যন্ত বিয়ে করত। ইসলাম সেটাকে ৪-এ সীমাবদ্ধ করেছে। এর কিছু হিকমত:

1. *সামাজিক সমাধান:* যুদ্ধ, বিধবা, তালাকপ্রাপ্তা নারীদের সামাজিক নিরাপত্তা দেওয়া।
2. *জনসংখ্যা ভারসাম্য:* নারীর সংখ্যা পুরুষের চেয়ে বেশি হলে বৈধ পন্থায় সমাধান।
3. *স্ত্রী অসুস্থ/সন্তানহীন:* স্ত্রী দীর্ঘমেয়াদী অসুস্থ বা সন্তান ধারণে অক্ষম হলে তালাক না দিয়ে দ্বিতীয় বিয়ের সুযোগ।
4. *পুরুষের স্বভাব:* কিছু পুরুষের চাহিদা বেশি হলে হারামের দিকে না গিয়ে হালাল পথে থাকা।

৫. সতর্কতা

কুরআন বহুবিবাহের অনুমতি দিয়েই বলেছে: *"যদি আশঙ্কা কর যে সুবিচার করতে পারবে না, তবে একজনই"*। আর পরে আবার বলেছে: *"তোমরা কখনও পূর্ণ সমতা করতে পারবে না"*।

তাই আলেমগণ বলেন: বহুবিবাহ মুবাহ - জায়েয কাজ। কিন্তু ইনসাফ করতে না পারলে এটি হারাম হয়ে যায়। রাসূল ﷺ নিজে ইনসাফের সর্বোচ্চ নমুনা ছিলেন।

সারকথা: ইসলাম বহুবিবাহ বন্ধ করেনি, কিন্তু একে কঠিন শর্ত দিয়ে বেঁধে দিয়েছে। উদ্দেশ্য হলো নারীর মর্যাদা রক্ষা ও সমাজের সমস্যার সমাধান করা, খাহেশাত পূরণ নয়। ইনসাফই এখানে মূল কথা। ইনসাফ না করতে পারলে এক বিয়েই উত্তম।

৪,জীবনের নতুন অধ্যায় : পরীক্ষার মুহূর্ত*

বিয়ের পূর্বে নারী বেশ দীর্ঘ একটা সময় নিজের বাবা-মার কাছে থাকে। এই সময়ে বাবা-মা তার প্রতিপালন করে। তাকে পড়াশোনাসহ সাংসারিক বিষয়াবলি শেখায়। অতঃপর বিয়ের সময় হলে উপযুক্ত পাত্রে তালাশ করে তাকে বিদায় দেয়। বিয়ের পূর্বে বাবা-মা সর্বদিক থেকে মেয়ের খেয়াল রাখে। তার সব ধরনের মান-অভিমান ও নখরা সহ্য করে। এমনকি পরিবারের ছোট-বড় সদস্যরাও তার ছোট-বড় সাধারণ বিষয়গুলো অনায়াসে মেনে নেয়। কিন্তু বিয়ের পর যখন সে শ্বশুরবাড়ি যায়, তখন যেহেতু পরিবেশটা তার জন্য একদমই নতুন হয়ে থাকে এবং ওই পরিবারের সবার সাথে তার সম্পর্কও কম থাকে, তাই শুরু দিকে শ্বশুরবাড়ির লোকজন তার বিভিন্ন বিষয়ে আপত্তি ওঠায়। ক্ষেত্রবিশেষ রুচিভিন্নতার দরুন সংশোধনের নিয়তে শাশুড়ি ও ননদরা বিভিন্ন ধরনের কথাও বলে থাকে। এই সময়টা একজন নতুন বউয়ের জন্য অনেক বড় পরীক্ষার সময়। তার প্রধান চিন্তা থাকে শ্বশুরবাড়িতে কীভাবে থাকব আর কীভাবেই বা জীবন কাটাব?

নববধূদের জন্য বিশেষ নির্দেশনা

বাবার বাড়ি থেকে বিদায়ের পর শাশুড়িকে মায়ের মতো, শ্বশুরকে বাবার মতো, দেবরকে ভাইয়ের মতো আর ননদকে নিজের বোনের মতো মনে করবেন। শ্বশুর-শাশুড়ির সাথে নিজের বাবা-মার মতো সদাচরণ করবেন। স্বামী ও শ্বশুর-শাশুড়ির খেদমত আবশ্যক মনে করবেন। তাদের মেজাজ ও রুচি-প্রকৃতি বোঝার চেষ্টা করবেন। শাশুড়ির কোনো কথার উত্তর কঠোর ভাষায় দেবেন না। শাশুড়ি কোনো বিষয়ে সতর্ক করলে চুপ থেকে তার কথা শুনবেন এবং আদবের সহিত প্রতিটি কথার উত্তর দেবেন। নরম ভাষায় বলবেন—আপনি যেভাবে বলছেন, ভবিষ্যতে সেভাবেই করব।

শ্বশুরবাড়ির সকল মুরব্বির সম্মান করবেন এবং ছোটদের স্নেহ করবেন। সাংসারিক কাজে অপচয় ও অপব্যয় থেকে দূরে থাকবেন। শাশুড়ি ও ননদদের সাথে পরামর্শ করে কাজ করবেন। শাশুড়ির কোনো কাজ অপছন্দ হলে স্বামীর কাছে তার নালিশ করবেন না। পিত্রালয়ের কোনো বিশেষ বৈশিষ্ট্যের কথা শ্বশুরবাড়িতে উল্লেখ করবেন না আবার শ্বশুরবাড়ির কোনো মন্দ দিক পিত্রালয়ে গিয়ে আলোচনা করবেন না। নিজের রুচির বিপরীত ও অপছন্দনীয় অনেক কিছুই সামনে আসবে, তাই অত্যন্ত সংযম নিয়ে সেগুলো সহ্য করবেন। ধৈর্য ও কৃতজ্ঞতার সহিত জীবন যাপন করবেন। নামাজ, রোজা ও সকল ইবাদতের প্রতি খেয়াল রাখবেন। সর্বদা হাসিখুশি ও আশাবাদী থাকবেন।

এই নির্দেশনাগুলো মেনে চললে ইনশাআল্লাহ সবসময় খুশি ও আনন্দে জীবন কাটাতে পারবেন এবং আল্লাহও আপনার প্রতি সন্তুষ্ট ও খুশি হয়ে যাবেন।

নববধূর জন্য ইসলামিক দিকনির্দেশনা

বিয়ের পর একজন মেয়ে নতুন পরিবারে যায়। সেখানে সুখী হতে ইসলাম নববধূকে কিছু গুরুত্বপূর্ণ দিকনির্দেশনা দিয়েছে:

১. নিয়ত শুদ্ধ করা

বিয়ে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য, এটা ইবাদত। রাসূল ﷺ বলেন: "বিয়ে আমার সুন্নাত।" [ইবনে মাজাহ: ১৮৪৬] তাই স্বামীর খেদমত, সংসার করাকেও ইবাদত মনে করবে।

২. স্বামীর হক আদায়

1. *আনুগত্য:* শরীয়তসম্মত কাজে স্বামীর কথা মানা ফরজ। রাসূল ﷺ বলেন: "নারী যদি ৫ ওয়াক্ত সালাত পড়ে, রমজানের রোজা রাখে, লজ্জাস্থানের হেফাজত করে ও স্বামীর আনুগত্য করে, তবে জান্নাতের যেকোনো দরজা দিয়ে প্রবেশ করবে।" [ইবনে হিব্বান: ৪১৬৩]

2. *কৃতজ্ঞতা:* স্বামীর প্রতি কৃতজ্ঞ থাকা। রাসূল ﷺ বলেছেন, জাহান্নামের অধিকাংশ নারী কারণ তারা স্বামীর অকৃতজ্ঞতা করে। [বুখারী: ২৯]

3. *সম্পদ ও ইজ্জতের হেফাজত:* স্বামীর অনুপস্থিতিতে তার ঘর, সম্পদ ও নিজের ইজ্জত রক্ষা করা। [সূরা নিসা: ৩৪]

৩. শ্বশুরবাড়ির সাথে সম্পর্ক

1. *শ্বশুর-শাশুড়িকে বাবা-মায়ের মতো সম্মান:* তাদের খেদমত করা নফল ইবাদত। এতে স্বামী খুশি হয়, সংসারে বরকত আসে।

2. *সবরের সাথে মানিয়ে নেওয়া:* নতুন পরিবেশে প্রথমে কষ্ট হতেই পারে। ধৈর্য ধরলে আল্লাহ সহজ করে দেন। [সূরা তালাক: ৭]

3. *ননদ-দেবরের সাথে পর্দা:* দেবর-ভাসুর মৃত্যুতুল্য। [বুখারী: ৫২৩২] তাই তাদের সাথে পর্দা রক্ষা করা ফরজ।

৪. নিজের দায়িত্ব

1. *সালাত ও পর্দা:* কোনো অবস্থায় ফরজ ছাড়বে না। নতুন পরিবেশে গিয়ে অনেকে পর্দা ছেড়ে দেয়, এটা বড় গুনাহ।

2. *ঘরকে জান্নাত বানানো:* ঘর পরিষ্কার রাখা, স্বামীর জন্য সাজগোজ করা, হাসিমুখে কথা বলা। রাসূল ﷺ বলেন: "সর্বোত্তম স্ত্রী সে, যার দিকে তাকালে স্বামী খুশি হয়।" [নাসাঈ: ৩২৩১]

3. *গোপনীয়তা রক্ষা:* স্বামীর দোষ, ঝগড়া, দৈহিক সম্পর্কের কথা বান্ধবী বা বাপের বাড়িতেও বলা হারাম। [মুসলিম: ১৪৩৭]

৫. যা এড়িয়ে চলবে

1. *স্বামীর সাথে তর্ক ও উঁচু গলায় কথা:* এতে ভালোবাসা নষ্ট হয়।

2. *অন্যের সংসারের সাথে তুলনা:* "ওর জামাই তো এটা দিছে" - এই তুলনা সংসার ধ্বংস করে।
3. *কুফরানুল আশীর:* সামান্য কষ্ট পেলেই "তোমার কাছে জীবনে সুখ পেলাম না" বলা। এটা জাহান্নামে যাওয়ার কারণ। [বুখারী: ২৯]

নববধূর জন্য বিশেষ দোয়া:
رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا
অর্থ: হে আমাদের রব, আমাদের জন্য আমাদের স্ত্রী ও সন্তানদেরকে চোখের শীতলতা দান করুন এবং আমাদেরকে মুত্তাকীদের ইমাম বানান। [সূরা ফুরকান: ৭৪]

মনে রাখবে: তুমি স্বামীর ঘরে রাণী। রাণীর মতো আচরণ করলে সম্মান পাবে। ছাড় দাও, ভালোবাসা দাও, আল্লাহ বরকত দেবেন। সংসারটা দুজনের, একা কারো না।

কোনো সমস্যা হলে প্রথমে আল্লাহর কাছে চাও, তারপর বিজ্ঞ কোনো নারী আলেমার সাথে পরামর্শ করো।

স্বামীর আনুগত্য ও মন বোঝার চেষ্টা - ইসলামিক দৃষ্টিকোণ*

প্রতিটা পুরূষ চায় তাঁর স্ত্রী তার আনুগত্য করূক। বিবাহের ক্ষেত্রে পুরুষ আনুগত্যশীল নারীকেই পছন্দ করে।
সংসারে শান্তি ও ভালোবাসা টিকিয়ে রাখার জন্য স্বামীর আনুগত্য এবং তার মন-মানসিকতা বোঝা খুব জরুরি। ইসলাম এ বিষয়ে ভারসাম্যপূর্ণ নির্দেশনা দিয়েছে।

১. স্বামীর আনুগত্য বলতে কী বোঝায়?

কুরআনের নির্দেশ:
الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ
অর্থ: "পুরুষরা নারীদের অভিভাবক, কারণ আল্লাহ তাদের একের ওপর অপরকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন এবং তারা তাদের সম্পদ থেকে ব্যয় করে।" [সূরা নিসা: ৩৪]

হাদীস শরীফে এসেছে:

عَنْ أَنِسٍ قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ :»المَرْأَةُ إِذَا صَلَّتْ خَمْسَهَا وَصَامَتْ شَهْرَهَا وَأَحْصَنَتْ فَرْجَهَا وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا فَلْتَدْخُلْ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَتْ«

আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ কোনো মহিলা যদি পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করে, রমাযানের সিয়াম পালন করে, গুপ্তাঙ্গের হিফাযাত করে, স্বামীর একান্ত অনুগত হয়। তার জন্য জান্নাতের যে কোনো দরজা দিয়ে ইচ্ছা প্রবেশের সুযোগ থাকবে।
(মিশকাত ৩২৫৪, হিলইয়াতুল আওলিয়া ৬/৩০৮)

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ سَعِيدٍ المَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قِيلَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ النِّسَاءِ خَيْرٌ قَالَ الَّتِي تَسُرُّهُ إِذَا نَظَرَ وَتُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَ وَلَا تُخَالِفُهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهَا بِمَا يَكْرَهُ

কুতায়বা (রহঃ) ... আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে প্রশ্ন করা হলো, কোন মহিলা উত্তম? তিনি বললেনঃ যে মহিলার প্রতি দৃষ্টিপাত স্বামীকে সন্তুষ্ট করে। সে আদেশ করলে তা সম্পন্ন করে, এবং তার বাড়ীর ও তার মালের ব্যাপারে যা অপছন্দ করে, সে তার বিরোধিতা করে।
(সুনানে নাসায়ী ৩২৩৪, মিশকাত ৩২৭২, সহীহাহ ১৮৩৮)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:

لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِغَيْرِ اللهِ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَا تُؤَدِّي الْمَرْأَةُ حَقَّ رَبِّهَا حَتَّى تُؤَدِّيَ حَقَّ زَوْجِهَا وَلَوْ سَأَلَهَا نَفْسَهَا وَهِيَ عَلَى قَتَبٍ لَمْ تَمْنَعْهُ

"যদি আমি কাউকে নির্দেশ দিতাম আল্লাহ ব্যতীত অন্যকে সিজদা করার, তাহ'লে স্ত্রীকে নির্দেশ দিতাম তার স্বামীকে সিজদা করার জন্য। ঐ সত্তার শপথ করে বলছি যার হাতে আমার জীবন, মহিলারা ঐ পর্যন্ত আল্লাহর হক আদায় করতে পারে না যতক্ষণ পর্যন্ত সে স্বামীর হক আদায় না করে, এমনকি স্বামী যদি যাত্রা পথে ঘোড়ার পৃষ্ঠেও

তাকেও আহবান করে তখনও তাকে বাধা না দেয়।" (ইবনে মাজাহ হা/১৮৫৩; সহীহাহ হা/১২০৩)

ব্যাখ্যা: এই হাদিসগুলোতে স্বামীর আনুগত্যের গুরুত্ব বোঝানো হয়েছে। তবে মনে রাখতে হবে, আনুগত্য শুধু শরীয়তসম্মত কাজে। আল্লাহর নাফরমানিতে কোনো সৃষ্টির আনুগত্য নেই।

আনুগত্যের সীমা:
শরীয়তের খেলাফ কোনো হুকুমে স্বামীর আনুগত্য নেই। রাসূল ﷺ বলেন: "স্রষ্টার অবাধ্যতায় কোনো সৃষ্টির আনুগত্য নেই।" [মুসনাদে আহমাদ: ১০৯৮]
যেমন: নামাজ পড়তে নিষেধ করলে, পর্দা ছাড়তে বললে, হারাম কাজে বাধ্য করলে - তখন মানা যাবে না।

২. স্বামীর মন বোঝার ৭টি উপায়

1. *মন দিয়ে শোনা:* সে যখন কথা বলে, মোবাইল রেখে চোখে চোখ রেখে শুনুন। পুরুষরা সমাধান চায় না, অনেক সময় শুধু শোনার মানুষ চায়।
2. *সম্মান দেওয়া:* পুরুষের সবচেয়ে বড় চাহিদা সম্মান। সবার সামনে তাকে ছোট করবেন না। ভুল হলেও আড়ালে নরম করে বলুন।
3. *প্রশংসা করা:* তার ছোট ছোট চেষ্টার প্রশংসা করুন। "আজকে বাজারটা সুন্দর করেছ", "বাচ্চাটাকে সময় দিলে আমার খুব ভালো লাগে" - এগুলো তাকে উৎসাহ দেয়।
4. *চাপ না দেওয়া:* অফিস থেকে ফিরেই সমস্যার লিস্ট ধরিয়ে দেবেন না। তাকে ২০-৩০ মিনিট নিজের মতো থাকতে দিন।
5. *তার পছন্দ জানা:* তার পছন্দের খাবার, রং, শখ কী - এগুলো খেয়াল করুন। রাসূল ﷺ আয়েশা রা. এর পছন্দ-অপছন্দ খেয়াল রাখতেন।
6. *দুঃসময়ে পাশে থাকা:* আর্থিক বা মানসিক কষ্টে খোঁটা না দিয়ে সাহস দিন। খাদিজা রা. নবীজির সবচেয়ে কঠিন সময়ে ঢাল হয়ে ছিলেন।

7. *দোয়া করা:* তাহাজ্জুদে তার হেদায়েত, রিজিক, সুস্থতার জন্য দোয়া করুন। মন ঘুরিয়ে দেওয়ার মালিক আল্লাহ।

আনুগত্য আর ব্যক্তিত্ব বিসর্জন এক না*

রাসূল ﷺ স্ত্রীদের পরামর্শ নিতেন। হুদায়বিয়ার সন্ধিতে উম্মে সালামা রা. এর পরামর্শে তিনি কাজ করেছিলেন।

মন না বুঝলে কী করবেন?

1. *সরাসরি জিজ্ঞাসা:* "আপনার কি মন খারাপ? আমি কি কোনো সাহায্য করতে পারি?" - নরম করে জিজ্ঞেস করুন।
2. *সময় দিন:* সব পুরুষ সাথে সাথে শেয়ার করে না। চাপ দিলে আরও চুপ হয়ে যায়।
3. *তৃতীয় পক্ষ নয়:* বাপের বাড়ি বা বান্ধবীর কাছে নালিশ প্রথমেই না। নিজেরা সমাধানের চেষ্টা করুন।

মূল কথা: স্বামী-স্ত্রী একে অপরের পোশাক। [সূরা বাকারা: ১৮৭] পোশাক যেমন দোষ ঢাকে, আরাম দেয়, সৌন্দর্য বাড়ায় - আনুগত্য আর বোঝাপড়াটাও তেমন।

স্বামীর হক আদায় করলে আল্লাহ খুশি হন। আর আল্লাহ খুশি হলে সংসারে বরকত আসবেই। স্বামীকে রাজা বানালে আপনি নিজেই রাণী হয়ে যাবেন।স্বামীর শাসক হয়ো না, স্বামীর রাণী হও! তাহলে সর্বদা সুখ পাবে!

দোয়া: رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ
"হে আমাদের রব, আমাদের স্ত্রী ও সন্তানদেরকে চোখের শীতলতা বানিয়ে দিন।" [সূরা ফুরকান: ৭৪]

৭,স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক ভালোবাসার রঙে রাঙানো - ইসলামিক উপায়*

কুরআনে আল্লাহ স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ককে বলেছেন "লিবাস" - পোশাক। [সূরা বাকারা: ১৮৭]

هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ

"তারা তোমাদের পোশাক এবং তোমরা তাদের পোশাক।"

পোশাক যেমন দোষ ঢাকে, লজ্জা নিবারণ করে, সৌন্দর্য বাড়ায়, আরাম দেয় - দাম্পত্যও তেমনই হওয়া উচিত। ভালোবাসা বাড়ানোর জন্য রাসূল ﷺ এর সুন্নাহ থেকে ৮টি রঙ:

১. সালামের রঙ - সম্মান
রাসূল ﷺ বলেন: "তোমরা জান্নাতে যাবে না যতক্ষণ ঈমান না আনবে। আর ঈমানদার হবে না যতক্ষণ একে অপরকে ভালো না বাসবে। আমি কি তোমাদের এমন কাজের কথা বলব না যা করলে তোমাদের মধ্যে ভালোবাসা সৃষ্টি হবে? তোমরা নিজেদের মধ্যে সালামের প্রসার ঘটাও।" [মুসলিম: ৫৪]
ঘরে ঢুকে সালাম দিন। বের হওয়ার সময় সালাম দিন। ভুল হলে আগে সালাম দিয়ে কথা শুরু করুন।

২. হাদিয়ার রঙ - উপহার
"তোমরা পরস্পর হাদিয়া দাও, ভালোবাসা বৃদ্ধি পাবে।" [বুখারী, আদাবুল মুফরাদ: ৫৯৪]
দামি কিছু লাগবে না। একটা ফুল, পছন্দের চকলেট,আইসক্রিম, ছোট চিরকুট - "আজ তোমাকে খুব মিস করেছি"আমি তোমাকে অনেক ভালোবাসি প্রিয়তমা।

৩. প্রশংসার রঙ - স্বীকৃতি
রাসূল ﷺ আয়েশা রা. কে "হুমায়রা" - লাল গোলাপ বলে ডাকতেন। তিনি স্ত্রীদের রান্নার প্রশংসা করতেন।

"ধন্যবাদ, আজ ভাতটা খুব মজা হয়েছে", "তুমি বাচ্চাদের খুব সুন্দর সামলাও" তুমি আমার প্রতি অনেকে যত্নশীল,- এই কথাগুলো জাদুর মতো কাজ করে।

৪. সময়ের রঙ - সঙ্গ
রাসূল ﷺ স্ত্রীদের সাথে গল্প করতেন, দৌড় প্রতিযোগিতা করতেন। [আবু দাউদ: ২৫৭৮]
মোবাইল রেখে দিনে ২০ মিনিট শুধু দুজন কথা বলুন। চা খেতে খেতে, ছাদে হাঁটতে হাঁটতে,ভালোলাগা/খারাপ লাগা শুনুন, বৃষ্টিমুখর দিনে তার হাত ধরে একটু বৃষ্টিতে ভেজা।

৫. স্পর্শের রঙ - মমতা
রাসূল ﷺ স্ত্রীকে চুমু দিয়ে মসজিদে যেতেন। [আবু দাউদ: ১৭৯]
কপালে চুমু, মাথায় হাত বুলানো, হাত ধরা - হালাল স্পর্শ ভালোবাসা বাড়ায়। গুনাহও মাফ হয়। রাসূল ﷺ বলেন: "স্বামী যখন স্ত্রীর দিকে তাকায় আর স্ত্রী স্বামীর দিকে তাকায়, আল্লাহ তাদের দিকে রহমতের দৃষ্টিতে তাকান। আর যখন তারা হাত ধরে, তাদের গুনাহ আঙুলের ফাঁক দিয়ে ঝরে পড়ে।" [জামে সগীর: ১৯৭]
বাসা থেকে বসিয়ে যাবার সময় একটু ভালোবাসুন,মেয়েরা ছোট্ট, ছোট্ট যত্নগুলোতে আবেগাপ্লুত হয়ে যায়।

৬. ক্ষমার রঙ - উদারতা
"মুমিন পুরুষ কোনো মুমিন নারীকে ঘৃণা করবে না। তার কোনো একটি অভ্যাস অপছন্দ হলেও অপরটি পছন্দ হবে।" [মুসলিম: ১৪৬৯]
ছোট ভুল ধরবেন না। ১০টা ভালোর জন্য ১টা খারাপ ভুলে যান।

৭. দোয়ার রঙ - রহমত
একে অপরের জন্য দোয়া করুন।
رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ
"হে আমাদের রব, আমাদের স্ত্রী-সন্তানদেরকে চোখের শীতলতা বানিয়ে দিন।" [সূরা ফুরকান: ৭৪]

তাহাজ্জুদে উঠে সঙ্গীর জন্য কাঁদুন। আল্লাহ দিলে মোহাব্বত ঢেলে দেবেন।

৮. হাসির রঙ - আনন্দ
রাসূল ﷺ মুচকি হাসতেন। ঘরে ঢুকেই স্ত্রীদের সাথে হাসি-ঠাট্টা করতেন।
একসাথে মজার স্মৃতি তৈরি করুন। পুরোনো ছবি দেখুন, হালাল কৌতুক বলুন।

৩টি বিষ থেকে বাঁচুন:
1. *তুলনা:* "ওর জামাই তো বিদেশ নিয়ে গেছে" - এই তুলনা সংসার পোড়ায়।
2. *সন্দেহ:* বিনা প্রমাণে সন্দেহ করলে বিশ্বাস ভাঙে। [সূরা হুজুরাত: ১২]
3. *তৃতীয় পক্ষ:* ঝগড়া হলে নিজেরা মিটান। চার দেয়ালের ভেতরেই আপনাদের কথা সীমাবদ্ধ রাখার চেষ্টা করুন।মা-বোন-বন্ধুকে প্রথমেই ডাকবেন না।

মনে রাখবেন: ভালোবাসা অটো আসে না, চাষ করতে হয়। রাসূল ﷺ বলেন: "তোমাদের মধ্যে উত্তম সে যে তার স্ত্রীর কাছে উত্তম।" [তিরমিজি: ৩৮৯৫]

আপনি আগে রাঙাতে শুরু করুন, দেখবেন আল্লাহর রহমতে পুরো সংসারটাই ভালোবাসার রঙে রঙিন হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ।

৭,পরিবার গঠনে স্বামী-স্ত্রীর ভূমিকা

ইসলামে পরিবার হলো সমাজের মূল ভিত্তি। আল্লাহ বলেন:
وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً
অর্থ: "তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের থেকেই স্ত্রীদের সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাদের কাছে প্রশান্তি পাও। আর তিনি তোমাদের মধ্যে ভালোবাসা ও দয়া সৃষ্টি করেছেন।" [সূরা রূম: ২১]

পরিবার গঠনে স্বামী-স্ত্রী দুজনের আলাদা কিন্তু পরিপূরক ভূমিকা আছে। একজন ঘরের ছাদ, অন্যজন খুঁটি।

১. স্বামীর ভূমিকা: অভিভাবক ও দায়িত্বশীল

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ [সূরা নিসা: ৩৪] - "পুরুষরা নারীদের অভিভাবক।"

ক. আর্থিক দায়িত্ব:

1. *ভরণপোষণ:* স্ত্রী-সন্তানের খাবার, পোশাক, বাসস্থান, চিকিৎসা দেওয়া স্বামীর উপর ফরজ। [সূরা বাকারা: ২৩৩]

2. *হালাল রিজিক:* ঘাম ঝরিয়ে হালাল উপার্জন করা। রাসূল ﷺ বলেন: "নিজের পরিবারের জন্য যা খরচ করবে, তাতেও সদকার সওয়াব পাবে।" [বুখারী: ৫৫]

খ. নৈতিক ও আধ্যাত্মিক দায়িত্ব:

1. *দ্বীনের শিক্ষা:* পরিবারকে জাহান্নাম থেকে বাঁচানো। يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا [সূরা তাহরীম: ৬]

2. *আদর্শ হওয়া:* রাসূল ﷺ বলেন: "তোমাদের মধ্যে উত্তম সে যে তার স্ত্রীর কাছে উত্তম।" [তিরমিজি: ৩৮৯৫] ঘরে রাগ, গালি, মারধর নয় - রহমত হতে হবে।

3. *নিরাপত্তা:* স্ত্রী-সন্তানের ইজ্জত ও জান-মালের হেফাজত করা।

২. স্ত্রীর ভূমিকা: প্রশান্তি ও ব্যবস্থাপক

রাসূল ﷺ বলেন: "দুনিয়া উপভোগের বস্তু। আর দুনিয়ার সর্বোত্তম উপভোগের বস্তু নেককার স্ত্রী।" [মুসলিম: ১৪৬৭]

ক. ঘরের অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থাপনা:

1. *স্বামীর সম্পদ ও ইজ্জতের হেফাজত:* স্বামীর অনুপস্থিতিতে তার ঘর, সম্পদ ও নিজের সতীত্ব রক্ষা করা। [সূরা নিসা: ৩৪]

2. *সন্তান প্রতিপালন:* মায়ের কোলই প্রথম মাদ্রাসা। সন্তানকে আদব, আখলাক, দ্বীন শেখানো মায়ের প্রধান কাজ। "মায়ের পায়ের নিচে সন্তানের জান্নাত।" [নাসাঈ: ৩১০৪]

3. *প্রশান্তির উৎস হওয়া:* স্বামী বাইরে থেকে ক্লান্ত হয়ে ফিরলে হাসিমুখে গ্রহণ করা, তার টেনশন ভাগ করে নেওয়া।

খ. নৈতিক ও আধ্যাত্মিক দায়িত্ব:

1. *স্বামীর আনুগত্য:* শরীয়তসম্মত কাজে স্বামীর কথা মানা। এতে জান্নাতের যেকোনো দরজা দিয়ে প্রবেশের সুযোগ মেলে। [ইবনে হিব্বান: ৪১৬৩]

2. *পরামর্শ দেওয়া:* রাসূল ﷺ হুদায়বিয়ায় উম্মে সালামা রা. এর পরামর্শ নিয়েছেন। স্ত্রী বুদ্ধিমতি হলে সংসার সুন্দর হয়।

৩. যৌথ ভূমিকা: দুজনে মিলে এক পরিবার

বিষয় দুজনের করণীয়

সন্তান লালন স্বামী অর্থ দেবে, স্ত্রী সময় দেবে। দুজনেই দ্বীন শেখাবে।

সমস্যা সমাধান وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ [সূরা শুরা: ৩৮] - পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত নেবে।

আত্মীয়তা দুজনের বাবা-মা, ভাই-বোনের হক আদায় করবে। সম্পর্ক ছিন্নকারী জান্নাতে যাবে না। [বুখারী: ৫৯৮৪]

ইবাদত একে অপরকে তাহাজ্জুদে ডেকে দেবে। [আবু দাউদ: ১৩০৮] একসাথে কুরআন পড়বে।

পরিবার ভাঙে ৩ কারণে:

1. *দায়িত্ব এড়ানো:* স্বামী খরচ না দিলে, স্ত্রী সংসার না দেখলে।

2. *অসম্মান:* খোঁটা দেওয়া, সবার সামনে ছোট করা।

3. *দ্বীনহীনতা:* নামাজ-কালাম না থাকলে ঘরে বরকত থাকে না।

মূল কথা: পরিবার একটা টিম। স্বামী ক্যাপ্টেন, স্ত্রী ভাইস-ক্যাপ্টেন। গোল একটাই - আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করে একসাথে জান্নাতে যাওয়া।

رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

"হে আমাদের রব, আমাদের স্ত্রী ও সন্তানদেরকে চোখের শীতলতা বানান এবং আমাদেরকে মুত্তাকীদের ইমাম বানান।" [সূরা ফুরকান: ৭৪]

৮,কম্বাইন্ড ফ্যামিলি ম্যানেজমেন্ট - শান্তিতে থাকার উপায়:*

যারা কম্বাইন্ড ফ্যামিলিতে থাকেন অর্থাৎ বাবা, মা, স্বামী, স্ত্রী- সবাই একসাথে। এখানে ভালোবাসাও বেশী পরিক্ষাও বেশী এক্ষেত্রে স্বামীর খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করা দরকার। দুজনের অধিকার- মা ও স্ত্রী। দুজনকেই সমান এবং কঠোরভাবে দেখতে হবে। মায়ের জন্য স্ত্রীর অধিকার কিংবা স্ত্রীর জন্য মায়ের অধিকার উপেক্ষা করা চলবে না।

সাংসারিক কাজ যদি দুজনকেই করতে হয় তবে ভাগ করে দিন। স্ত্রী যদি দুপুরে রান্না করে তবে মা রাতে করতে পারে। কিন্তু দুজনে মিলে রান্না না করাই বেটার। কারণ তখন প্রত্যেকেই স্বাধীনভাবে নিজের মনের মতো করে কাজগুলো করতে পারবে।

আর একান্তই যদি মিল না হয় এবং যদি সামর্থ্য থাকে তবে আলাদা বাসায় থাকা যেতে পারে। এর দ্বারা মা-বাবার সাথে সম্পর্ক আরও ভালো হতে পারে; আরও ভালোভাবে খেদমত করা যেতে পারে।

আরেকটা বিষয় হলো- মায়ের জন্য যত ইচ্ছা খরচ করবেন কিন্তু বিষয়টা পুরোপুরি স্ত্রীকে জানানোর দরকার নেই। আবার একই রকমভাবে স্ত্রীর জন্যও খরচ করবেন। কিন্তু সবকিছু মাকে জানানোর দরকার নেই।

কম্বাইন্ড ফ্যামিলি ম্যানেজমেন্ট - শান্তিতে থাকার উপায়:

যারা কম্বাইন্ড ফ্যামিলিতে থাকেন অর্থাৎ বাবা, মা, স্বামী, স্ত্রী- সবাই একসাথে। এখানে ভালোবাসাও বেশী পরিক্ষাও বেশী এক্ষেত্রে স্বামীর খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করা দরকার। দুজনের অধিকার- মা ও স্ত্রী। দুজনকেই সমান এবং কঠোরভাবে দেখতে হবে। মায়ের জন্য স্ত্রীর অধিকার কিংবা স্ত্রীর জন্য মায়ের অধিকার উপেক্ষা করা চলবে না।

সাংসারিক কাজ যদি দুজনকেই করতে হয় তবে ভাগ করে দিন। স্ত্রী যদি দুপুরে রান্না করে তবে মা রাতে করতে পারে। কিন্তু দুজনে মিলে রান্না না করাই বেটার। কারণ তখন প্রত্যেকেই স্বাধীনভাবে নিজের মনের মতো করে কাজগুলো করতে পারবে।

আর একান্তই যদি মিল না হয় এবং যদি সামর্থ্য থাকে তবে আলাদা বাসায় থাকা যেতে পারে। এর দ্বারা মা-বাবার সাথে সম্পর্ক আরও ভালো হতে পারে; আরও ভালোভাবে খেদমত করা যেতে পারে।

আরেকটা বিষয় হলো- মায়ের জন্য যত ইচ্ছা খরচ করবেন কিন্তু বিষয়টা পুরোপুরি স্ত্রীকে জানানোর দরকার নেই। আবার একই রকমভাবে স্ত্রীর জন্যও খরচ করবেন। কিন্তু সবকিছু মাকে জানানোর দরকার নেই।

মায়ের জন্য ওয়াইফের অধিকার কিংবা ওয়াইফের জন্য মায়ের অধিকার নষ্ট করা চলবে না। মা ছেলেকে প্রাণ দিয়ে ভালোবাসে। আর অন্যদিকে একজন ওয়াইফও তার স্বামীকে সব ছেড়ে চলে এসেছে হাজারেবন্ডের ভালোবাসা পাওয়ার জন্য। মা যখন দেখে ভালোবাসার অর্ধেক ওয়াইফ নিয়ে গেছে, আবার ওয়াইফ যখন দেখে তার ভালোবাসার অর্ধেক মায়ের কাছে, এই বিষয়টা ছেলেকেই বুঝতে হবে। গনের সূচনা হয়। মূলত এটি ভালোবাসার কম্পিটিশন। অন্য কোনো বিষয় নয়। আর এই দুটি সম্পর্ককেই কোনো যুক্তি-তর্ক চলে না। বরং দুটি সম্পর্কই হলো ভালোবাসার।
যদি বাসায় আসার পর মা, বিবির সম্পর্কে বিভিন্ন অভিযোগ করতে থাকে তবে মাকে সান্ত্বনা দেওয়া, এবং বিষয়টাকে খুব গুরুত্ব দিয়ে, সরকারী কর্মচারীদের মতো, "কীভাবে ও এত খারাপ কাজ করল, দেখছি বিষয়টা" ইত্যাদি বলে সান্ত্বনা দেওয়া। এবং কিছুক্ষণ পরেই এই বিষয়টা ভুলে যাওয়া এবং ওয়াইফের কাছে গিয়ে কোনো প্রতিক্রিয়া না দেখানো।

অন্যদিকে ওয়াইফও যদি মা সম্পর্কে কোনো অভিযোগ করে সেখানেও একইভাবে, "মাকে বলে দিব যাতে এরকম না করে" এরকম বলে সান্ত্বনা দেওয়া কিন্তু এই বিষয় নিয়ে আবার মায়ের কাছে কোনো প্রতিক্রিয়া না দেখানো।

বিবির কথা শুনে বাবা-মায়ের সাথে খারাপ আচরণ যেমন গর্হিত কাজ ঠিক একইভাবে মায়ের কথা শুনে ওয়াইফের সাথে খারাপ আচরণ করাও গর্হিত কাজ। কারণ ঘর কোনো হাইকোর্ট বা বিচারালয় নয়। বরং ঘর হলো ভালোবাসার জায়গা।

। ইসলাম আর অভিজ্ঞতা মিলিয়ে কিছু প্র্যাকটিক্যাল রুলস দিচ্ছি:

১. নিয়ত ঠিক করুন - এটা ইবাদত
শ্বশুর-শাশুড়ির খেদমত করা নফল ইবাদত। রাসূল ﷺ বলেন: "বৃদ্ধ মুসলিমকে সম্মান করা আল্লাহকে সম্মান করার অন্তর্ভুক্ত।" [আবু দাউদ: ৪৮৪৩]
মনে করবেন, এটা আপনার জান্নাতের রাস্তা। খেদমত করলে স্বামীর দিল খুশি হয়, ঘরে বরকত আসে।

২. সীমারেখা ঠিক করুন - আদবের সাথে
যা করতে হবে:
- *পর্দা:* দেবর-ভাসুর মৃত্যুতুল্য। [বুখারী: ৫২৩২] তাদের সামনে পর্দা ফরজ। এটা সম্পর্ক নষ্ট করে না, বরং সম্মান বাড়ায়।
- *গোপনীয়তা:* স্বামী-স্ত্রীর একান্ত কথা, ঝগড়া শ্বশুরবাড়ির কাউকে বলবেন না। এটা আমানতের খেয়ানত। [মুসলিম: ১৪৩৭]
- *প্রাইভেসি:* আপনাদের আলাদা ঘর, আলাদা সময় রাখুন। সপ্তাহে ১ দিন শুধু দুজনের জন্য রাখুন।

৩. শ্বশুর-শাশুড়ির সাথে সম্পর্কের ৪ মূলনীতি
1. *মা-বাবার মতো দেখুন:* তারা আপনার স্বামীর জান্নাত-জাহান্নাম। তাদের খেদমত মানে স্বামীর দিল জয় করা।
2. *চুপ থাকার শিল্প:* শাশুড়ি বকলে সাথে উত্তর দেবেন না। শুন, মাথা নাড়ুন, বলুন "আচ্ছা মা, আপনি যেভাবে বলবেন"। পরে সময় বুঝে নরম করে বোঝান।
3. *ছোট ছোট খেদমত:* চা বানিয়ে দেওয়া, পা টিপে দেওয়া, অসুখে সেবা করা। বড় বড় কাজের চেয়ে এই ছোট কাজগুলোই দিল জয় করে।
4. *তুলনা করবেন না:* "আমার মা তো এমন করে না" - এই একটা বাক্য ১০ বছরের সম্পর্ক নষ্ট করে দেয়।

৪. দেবর-নদের সাথে সম্পর্ক
- *ননদ:* তাকে বোনের মতো দেখুন। তার বিয়ের সময়, বাচ্চা হলে এগিয়ে যান। ননদ শত্রু না হলে সংসারের ৫০% ঝামেলা কমে যায়।

- *দেবর:* তার সাথে কঠোর পর্দা। কথা বলতে হলে দরজার ওপাশ থেকে, সংক্ষেপে। হাসি-ঠাট্টা, একা থাকা যাবে না।

৫. ঝগড়া হলে ম্যানেজ করার নিয়ম
1. *স্বামীর সামনে শাশুড়ির বদনাম নয়:* স্বামী মাঝখানে পড়ে যায়। তার বদলে বলুন "মা একটু রেগে আছেন, পরে বুঝিয়ে বলব"।
2. *ভুল হলে স্বীকার করুন:* "সরি মা, আমার ভুল হয়েছে" - এই একটা বাক্য আগুন নিভিয়ে দেয়।
3. *তৃতীয় পক্ষ নয়:* বাপের বাড়ি গিয়ে নালিশ করলে আগুনে ঘি পড়ে। নিজেরা সমাধান করুন।

৬. অর্থনৈতিক বিষয়
- *স্বচ্ছতা:* ইনকাম-খরচ নিয়ে গোপনীয়তা রাখবেন না। স্বামীকে বলুন সবাইকে বুঝিয়ে বলতে।
- *আলাদা খরচ:* আপনাদের ব্যক্তিগত খরচ আলাদা রাখুন। সব এক খাতায় মিশিয়ে ফেললে মনমালিন্য হয়।

৯*সন্তান লালন-পালন ও তারবিয়াহ*

বাচ্চা দ্বীনদার হওয়ার জন্য বাবার পাশাপাশি সবচেয়ে বড় ভূমিকা থাকে মায়ের। সন্তানের মেজাজ ও তরবিয়ত তৈরিতে মায়ের তরবিয়তের বিকল্প নেই। একজন দ্বীনদার মা একজন দ্বীনদার জাতি উপহার দিতে পারে। আজকের সন্তান আগামীর ভবিষ্যত। এদের সঠিক পরিচর্যা ছাড়া সমাজের বস্তুনিষ্ঠ পরিবর্তন, সার্বজনীন ও শাশ্বত কল্যাণ আশা করা যায় না।

কুরআনে ইরশাদ হয়েছে:
> "তারবিয়াহ" মানে শুধু খাওয়ানো-পড়ানো নয়। এটা হলো সন্তানের আকীদা, আখলাক, ইবাদত, চরিত্র সবকিছু গড়ে তোলা। আল্লাহ বলেন:

> *يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا*

> _অর্থ:_ "হে ঈমানদারগণ, তোমরা নিজেদেরকে ও তোমাদের পরিবারকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাও।"

---

১. জন্মের আগে ও পরে যা করবেন

জন্মের আগে:
- স্বামী-স্ত্রী দুজনেই হাল রিজিক খান। হারাম খাবার সন্তানের চরিত্রে প্রভাব ফেলে।
- গর্ভাবস্থায় কুরআন তিলাওয়াত শোনান, ভালো কথা বলুন।
- নেক সন্তানের জন্য দোয়া করুন:

رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ

"হে আমার রব, আমাকে নেক সন্তান দান করুন।"

জন্মের পরে:
- *আযান-ইকামত:* ডান কানে আযান, বাম কানে ইকামত দিন।
- *আকীকা:* ৭ম দিনে আকীকা করুন, মাথা মুণ্ডন করে নাম রাখুন।
- *ভালো নাম:* অর্থপূর্ণ ইসলামিক নাম রাখুন। রাসূল ﷺ বলেন: "কিয়ামতের দিন তোমাদের নাম ও বাবার নাম ধরে ডাকা হবে, তাই সুন্দর নাম রাখো।"

---

২. ৭ বছর পর্যন্ত - ভালোবাসা ও আদব শেখানোর সময়
এই বয়সে শাসন নয়, ভালোবাসা আর খেলা দিয়ে শেখান।
- *তাওহীদ শেখান:* "আল্লাহ কোথায়?" - "আসমানে"। "কে তোমাকে বানিয়েছেন?" - "আল্লাহ"।
- *আদব শেখান:* সালাম দেওয়া, বিসমিল্লাহ বলা, বড়দের সম্মান করা।
- *গল্প বলুন:* নবী-রাসূলদের গল্প, সাহাবাদের কাহিনী। বাচ্চারা গল্প দিয়ে শেখে।
- *শারীরিক শাসন নয়:* রাসূল ﷺ কখনো বাচ্চাকে মারেননি।

৩. ৭-১০ বছর - ইবাদতের অভ্যাস

রাসূল ﷺ বলেন: "তোমরা তোমাদের সন্তানদের ৭ বছর বয়সে নামাজের আদেশ দাও, ১০ বছর বয়সে নামাজের জন্য প্রহার করো।"
- নামাজ, রোজা, পর্দার অভ্যাস করান।
- কুরআন শেখান। হাফেজ বানানো সম্ভব না হলেও নিয়মিত তিলাওয়াতের অভ্যাস করান।
- সত্য বলা, আমানত রক্ষা করা শেখান।

৪. ১০ বছরের পর - বন্ধু হয়ে পথ দেখান
এই বয়সে শাসন করলে দূরে সরে যাবে। বন্ধু হন।
- *সময় দিন:* দিনে ১৫ মিনিট শুধু তার কথা শুন। মোবাইল সরিয়ে রাখুন।
- *দ্বীন শেখান:* হাল-হারাম, পর্দা, গীবত, মিথ্যার ক্ষতি বোঝান।
- *দায়িত্ব দিন:* ঘরের ছোট কাজ দিন। এতে আত্মবিশ্বাস বাড়ে।
- *ভুল করলে বোঝান, অপমান নয়:* "তুমি খারাপ" না বলে "তুমি যে কাজটা করলে সেটা খারাপ" বলুন।

---

৫. যা এড়িয়ে চলবেন
1. *তুলনা:* "ওর ছেলে A+ পায়, তুই পাস না কেন?" - এতে হীনমন্যতা তৈরি হয়।
2. *মিথ্যা ওয়াদা:* "পড়লে চকলেট দেব" বলে না দিলে সে মিথ্যাবাদী হবে।
3. *মোবাইল-কার্টুনে আসক্তি:* ছোট বয়সে স্ক্রিন টাইম কমান। এটা মস্তিষ্ক নষ্ট করে।
4. *ঝগড়া দেখানো:* স্বামী-স্ত্রীর ঝগড়া বাচ্চার সামনে করবেন না। এতে সে নিরাপত্তাহীনতায় ভোগে।

---

৬. মা-বাবা দুজনের ভূমিকা

বাবার ভূমিকা মায়ের ভূমিকা
বাইরে থেকে হাল রিজিক আনা ঘরে দ্বীনি পরিবেশ তৈরি করা
সন্তানকে সময় দেওয়া, খেলাধুলা করা সন্তানকে কুরআন-দোয়া শেখানো

কঠোর হলেও ন্যায়বিচার করা কোমলতা ও মমতা দিয়ে আগলে রাখা

রাসূল ﷺ বলেন: "প্রত্যেক শিশু ফিতরাতের উপর জন্মগ্রহণ করে। তারপর তার মা-বাবা তাকে ইহুদি, খ্রিষ্টান বা মাজুসি বানায়।"

সবচেয়ে বড় তারবিয়াহ হলো নিজে আমল করা। আপনি নামাজ না পড়ে বাচ্চাকে নামাজে ডাকলে সে শুনবে না। আপনি যা করবেন, বাচ্চা সেটাই কপি করবে।

নিয়মিত পড়ুন এই দোয়া:

رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِن ذُرِّيَّتِي ۚ رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ

"হে আমার রব, আমাকে নামাজ কায়েমকারী বান এবং আমার বংশধরদের মধ্য থেকেও। হে আমাদের রব, আমার দোয়া কবুল করুন।"

সন্তান আপনার সাদকায়ে জারিয়া। তাকে মানুষ করুন, সে আপনার জন্য কবরে থেকেও সওয়াব পাঠাবে ইনশাআল্লাহ।

অধ্যায়:৩ পারিবারিক অবক্ষয়ের কারণ

১,পর্দাহীনতা:

পর্দাহীনতা - বিস্তারিত আলোচনা

পর্দাতেই নারীর সম্মান ও নিরাপত্তা

এ কথা সকলের জানা থাকা উচিত যে, ইসলাম লজ্জা ও শালীনতা, পবিত্রতা ও চারিত্রিক নিষ্কলুষতা এবং ব্যক্তিত্ব ও আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন ধর্ম। ইসলাম মানবতাকে অনেক উঁচু মর্যাদা দান করেছে। মানুষ ও জন্তু-জানোয়ারের মাঝে যে পার্থক্য, ইসলামের বিধিবিধানের মাধ্যমে তা স্পষ্ট হয়ে যায়। ইসলাম কখনো এ কথা সহ্য করে না যে, মানুষের মধ্যে পাশবিকতা চলে আসুক আর মানুষ চতুষ্পদ জন্তুর ন্যায় জীবনযাপন করা শুরু করুক। এ কারণেই মুসলিম নারীদের সম্মান ও মর্যাদা ঘরের ভেতর অবস্থান করা এবং বিনা প্রয়োজনে ঘর থেকে বের না হওয়ার মাঝেই নিহিত রয়েছে।

লজ্জা ও শালীনতা নারীর সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য ও ভূষণ। শালীনতার ফলস্বরূপ পবিত্রতা ও নির্মলতাও তার একটি বিশেষ গুণ। নারীর সকল গুণের সমন্বয় এখানেই। যদি কোনো নারীর মধ্যে বাহ্যিক সকল গুণাবলি বিদ্যমান থাকে আর শালীনতা ও পবিত্রতার মতো বহুমূল্যের বৈশিষ্ট্য না থাকে, তাহলে পবিত্র শরিয়ত ও বিবেকবান মানুষের দৃষ্টিতে সে একেবারেই মূল্যহীন; বরং শরিয়ত তো তাকে তিরস্কার ও তস্খ্যায়িত করেছে।

পর্দা কেন করতে হয়?

ইসলামের বিধিবিধান সে আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে, যিনি আমাদের মনের সকল কথা জানেন। তিনি যদি আমাদের জীবনাচারকে সীমাবদ্ধ করেন, তবে নিশ্চয় তা আমাদের কল্যাণের জন্যই এবং আমাদেরকে ক্ষতি থেকে রক্ষা করার জন্যই।

আল্লাহ তাআলা ফিতনা-ফাসাদ প্রতিহত করার লক্ষ্যে নারী-পুরুষ সকলের জন্যই বিভিন্ন নিয়ম-কানুন প্রণয়ন করেছেন, যাতে মানুষের বংশপরিচয় স্থায়ী ও নিরাপদ থাকে। এজন্য আল্লাহ তাআলা এমন সব কাজই নিষেধ করেছেন, যার দ্বারা পরপুরুষ কোনো নারীর প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার আশঙ্কা আছে। তাই আল্লাহ তাআলা নারীদের সৌন্দর্য প্রকাশ করতে নিষেধ করেছেন এবং তা হারাম করে দিয়েছেন। রক্তের ও বৈবাহিক সম্পর্কের ভিত্তিতে কোন পুরুষের সাথে ফিতনায় পতিত হওয়ার আশঙ্কা নেই, কাদের সামনে সৌন্দর্য প্রদর্শনে নিষেধাজ্ঞা নেই এবং কাদের সামনে সৌন্দর্য প্রকাশ পেলেও ফিতনা হওয়ার আশঙ্কা নেই— সবার কথা বিস্তারিত বর্ণনা করে দিয়েছেন।

ফিতনা নির্মূল করার লক্ষ্যেই আল্লাহ নারীদেরকে এমনভাবে চলাচল করতে নিষেধ করেছেন, যার দ্বারা তাদের পরিচ্ছদের অভ্যন্তরের সৌন্দর্য প্রকাশ হওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়। তদ্রূপ তাদেরকে জেনেবুঝে নিজেদের দেহ প্রদর্শন করে বেড়াতে নিষেধ করেছেন।

---

১. পর্দার শরয়ী সংজ্ঞা ও সীমা

পর্দা শুধু কাপড় নয়, এটা একটা পূর্ণাঙ্গ সিস্টেম।

নারীর পর্দা:
নারীদের জন্য:
> وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا
> "মুমিন নারীদের বলো, তারা যেন তাদের দৃষ্টি অবনত রাখে, লজ্জাস্থানের হেফাজত করে এবং তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে, তবে যা স্বাভাবিকভাবে প্রকাশ পায় তা ছাড়া।" [সূরা নূর: ৩১]

- *শরীর:* চেহারা ও হাতের তালু ছাড়া পুরো শরীর ঢাকা ফরজ। এটাই জমহুর উলামার মত। হানাফি, মালেকি, শাফেয়ি, হাম্বলি চার মাজহাবেই এটা মুস্তাহাব বা ফরজ বলা হয়েছে।

- *কাপড়ের শর্ত ৫টি:*

1. ঢিলেঢালা হতে হবে, শরীরের গঠন বোঝা যাবে না।
2. মোটা হতে হবে, ভেতর দেখা যাবে না।
3. আকর্ষণীয় রং-ডিজাইনের হবে না।
4. পুরুষের পোশাকের মতো হবে না।
5. কাফির-ফাসিকদের পোশাকের অনুকরণ হবে না।

পুরুষের পর্দা:

পুরুষদের জন্য:

> قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغْضُضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ

> "মুমিন পুরুষদের বলো, তারা যেন তাদের দৃষ্টি অবনত রাখে এবং লজ্জাস্থানের হেফাজত করে।" [সূরা নূর: ৩০]

নাভি থেকে হাঁটু পর্যন্ত ঢাকা ফরজ। আর চোখ, কান, জবানের পর্দা সবার জন্য ফরজ। গায়রে মাহরাম মেয়ের দিকে শাহওয়াতের সাথে তাকানো হারাম।

---

২. পর্দাহীনতার প্রকারভেদ

এটা শুধু কাপড় খোলার নাম নয়, আচরণগত পর্দাহীনতাও আছে:

ধরন উদাহরণ দলিল

শারীরিক

পাতলা, টাইট, ছোট পোশাক وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ [নূর: ৩১]

কণ্ঠগত

পরপুরুষের সাথে ন্যাকামি করে কথা বলা فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ [আহযাব: ৩২]

দৃষ্টিগত

ইচ্ছাকৃতভাবে গায়রে মাহরামের দিকে তাকানো يَغْضُضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ [নূর: ৩০]

চলনগত

এমনভাবে চলা যাতে সাজগোজ বোঝা যায় وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ [নূর: ৩১]

ডিজিটাল সোশ্যাল মিডিয়ায় বেপর্দা ছবি-রিলস দেওয়া وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا [কাহফ: ২৮]

---

৩. পর্দাহীনতার কারণ

1. *ঈমানী দুর্বলতা:* আল্লাহর ভয় কমে গেলে হুকুম হালকা লাগে।
2. *পরিবেশ:* পরিবার, বন্ধু, মিডিয়া যদি বেপর্দাকে নরমালাইজ করে, তখন লজ্জা চলে যায়।
3. *জাহিলিয়াত:* পর্দা কেন ফরজ হয়েছে তা না জানা। অনেকে ভাবে এটা শুধু আরবদের কালচার।
4. *দুনিয়ার মোহ:* জব, ফ্যাশন, লাইক-কমেন্টের জন্য দ্বীন ছেড়ে দেয়।
5. *শয়তানের ধোঁকা:* "তোমার মন পরিষ্কার তো পর্দা লাগবে না" - এটা শয়তানের প্রথম স্টেপ।

৪. কুরআন-সুন্নাহর আরো দলিল

- *সূরা আহযাব ৫৯:*

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ

"হে নবী, তুমি তোমার স্ত্রী, কন্যা ও মুমিন নারীদের বলো, তারা যেন তাদের জিলবাব নিজেদের উপর টেনে দেয়।"

- *হাদিস:* রাসূল ﷺ বলেন, "দুই শ্রেণির জাহান্নামী আমি দেখিনি... এক শ্রেণি হলো সেই নারী যারা কাপড় পরেও উলঙ্গ, পুরুষকে আকর্ষণ করে ও নিজে আকৃষ্ট হয়।" [মুসলিম: ২১২৮]

- *আয়েশা রা. বলেন:* "আবু বকর রা. এর মেয়ে আসমা যখন পাতলা কাপড়ে রাসূল ﷺ এর কাছে এলেন, তিনি মুখ ফিরিয়ে নিলেন এবং বললেন: হে আসমা, নারী বালেগা হলে তার এগুলো ছাড়া আর কিছু দেখা জায়েজ নয়" বলে হাত ও চেহার দিকে ইশারা করলেন। [আবু দাউদ: ৪১০৪]

৫. পর্দার হিকমত বা প্রজ্ঞা

আল্লাহ কিছু হারাম করেন শুধু শাস্তি দেওয়ার জন্য নয়, হিফাজতের জন্য।

1. *নারীর ইজ্জত হিফাজত:* রাস্তায় হাঁটলে কেউ বিরক্ত করবে না। যেমন আল্লাহ বলেন: ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ [আহযাব: ৫৯]
2. *সমাজে পবিত্রতা:* চোখের যিনা, অন্তরের যিনা কমে।
3. *নারী-পুরুষের সম্পর্ক সুস্থ রাখা:* অবাধ মেলামেশা বন্ধ হয়, বিয়ের পবিত্রতা রক্ষা পায়।
4. *নারীর মর্যাদা:* পর্দা নারীকে পণ্য বানায় না, বরং মর্যাদা দেয়।

৬. কিছু ভুল ধারণার জবাব

ভুল ১: "আমার মন ভালো, পর্দা লাগে না"
জবাব: সাহাবিয়াদের মন কি আপনার চেয়ে খারাপ ছিল? আল্লাহ তাদেরকেই পর্দার হুকুম দিয়েছেন।

ভুল ২: "আগে মন পাল্টাই, পরে পর্দা করব"
জবাব: আমলই অন্তর পাল্টায়। নামাজ না পড়ে কেউ নামাজি হয় না।

ভুল ৩: "এখন তো গরম, পর্দা করা যায় না"
জবাব: জাহান্নামের আগুন এর চেয়ে ৭০ গুণ বেশি গরম। [বুখারী: ৩২৬৫]

৭. প্র্যাকটিক্যাল স্টেপ

যদি আপনি পর্দা শুরু করতে চান:

1. *নিয়ত ঠিক করুন:* মানুষকে দেখানোর জন্য নয়, শুধু আল্লাহর জন্য।
2. *ছোট থেকে শুরু করুন:* হিজাব দিয়ে শুরু করুন, তারপর ঢিলে জামা।
3. *সাহস রাখুন:* লোকে কী বলবে সেটা ভাববেন না। আল্লাহ বলবেন তো?
4. *সোহবত বদলান:* দ্বীনদার বান্ধবীদের সাথে মিশুন।
5. *দোয়া করুন:* اللَّهُمَّ اهْدِنِي وَسَدِّدْنِي - "হে আল্লাহ, আমাকে হিদায়াত দিন এবং সোজা রাখুন।"

শেষ কথা:
পর্দা হলো আল্লাহর সাথে বান্দার ভালোবাসার চুক্তি। যে আল্লাহকে ভালোবাসে, সে তাঁর হুকুমকে ভালোবাসে।
দুনিয়ার ২ দিনের লাইক-ফলোয়ারের জন্য আখিরাতের অনন্ত নিয়ামত হারানো কি বুদ্ধিমানের কাজ?
উত্তর: অবশ্যই না।

২,ফ্রি-মিক্সিং সভ্যতা - ইসলামের দৃষ্টিতে*

"ফ্রি-মিক্সিং" মানে গায়রে মাহরাম নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা, কোনো শরয়ী সীমানা ছাড়াই একসাথে কাজ, আড্ডা, পড়াশোনা, অনুষ্ঠান করা। পশ্চিমা "আধুনিক সভ্যতা" এটাকে স্বাভাবিক ও প্রগতির চিহ্ন বলে, কিন্তু ইসলামের দৃষ্টিতে এটা ফিতনার বড় দরজা।

১. ইসলাম কী বলে?

ইসলাম নারী-পুরুষের মেলামেশা পুরোপুরি বন্ধ করেনি, বরং নিয়ন্ত্রিত করেছে।

কুরআনের মূলনীতি:
1. *দৃষ্টি অবনত রাখা:*

قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغْضُضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ
قُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ

[সূরা নূর: ৩০-৩১]

চোখই ফিতনার প্রথম ধাপ। তাই প্রথমে দৃষ্টির হেফাজত।

2. *কথায় কোমলতা বর্জন:*

فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ

"তোমরা কোমল স্বরে কথা বলো না, যাতে যার অন্তরে ব্যাধি আছে সে লালসা করে।" [সূরা আহযাব: ৩২]

3. *পৃথক থাকার নির্দেশ:*

وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ

"তোমরা যখন তাদের কাছে কিছু চাইবে, পর্দার আড়াল থেকে চাইবে।" [সূরা আহযাব: ৫৩]

এটা নবী ﷺ এর স্ত্রীদের জন্য নাজিল হলেও উম্মতের জন্য আদর্শ।

হাদিস:

রাসূল ﷺ বলেন, "কোনো পুরুষ যেন কোনো নারীর সাথে নির্জনে না থাকে, মাহরাম ছাড়া।" [বুখারী: ৫২৩]

"আমি পুরুষদের জন্য নারীদের চেয়ে বড় কোনো ফিতনা রেখে যাইনি।" [বুখারী: ৫০৯৬]

২. ফ্রি-মিক্সিং এর ক্ষতি

ইসলাম শুধু "হারাম" বলে থামে না, এর পেছনের হিকমত দেখায়।

ব্যক্তিগত ক্ষতি:

- *অন্তরের রোগ:* অবাধ মেলামেশায় অন্তরে গুনাহের আকর্ষণ বাড়ে, লজ্জা কমে যায়।

- *চোখ-অন্তরের যিনা:* রাসূল ﷺ বলেন, "চোখের যিনা হলো তাকানো, কানের যিনা হলো শোনা।" [মুসলিম: ২৬৫৭]

- *মানসিক অশান্তি:* হারাম সম্পর্ক, হতাশা, আত্মসম্মানহানি।

সামাজিক ক্ষতি:

- *ব্যভিচার ও পরকীয়ার বিস্তার:* ফ্রি-মিক্সিং ব্যভিচারের দিকে ধীরে ধীরে নিয়ে যায়। আল্লাহ বলেন, "তোমরা ব্যভিচারের ধারে-কাছেও যেও না।" [সূরা ইসরা: ৩২]
- *পরিবার ভাঙন:* স্বামী-স্ত্রীর মাঝে সন্দেহ, বিশ্বাসহীনতা।
- *নারীর মর্যাদাহানি:* নারীকে ব্যক্তিত্বের বদলে সৌন্দর্যের পণ্য বানিয়ে ফেলে।

৩. "কিন্তু কাজ-পড়াশোনায় তো মিশতে হয়?"

ইসলাম প্রয়োজন অস্বীকার করে না। ডাক্তারি, শিক্ষা, ব্যবসার জন্য মেলামেশা লাগলে শর্তসাপেক্ষে জায়েজ:

1. *প্রয়োজন সীমিত থাকবে:* অপ্রয়োজনীয় আড্ডা, হাসি-ঠাট্টা নয়।
2. *পর্দা বজায় থাকবে:* নারী-পুরুষ উভয়ের শরয়ী পর্দা।
3. *একাকী নির্জনতা নয়:* বন্ধ রুমে দুজন একা নয়।
4. *নিয়ত শুদ্ধ থাকবে:* কাজের জন্য, ফিতনার জন্য নয়।

সাহাবিয়ারা মসজিদে, বাজারে, যুদ্ধে যেতেন, কিন্তু পর্দা ও শালীনতা বজায় রেখে।

৪. ইসলামি বিকল্প কী?

ইসলাম বলে: আলাদা করো, কিন্তু বঞ্চিত করো না।

- নারীদের জন্য আলাদা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, কর্মক্ষেত্র।
- প্রয়োজনে পর্দা মেনে কাজ করা।
- সমাজে হায়া ও লজ্জাশীলতাকে সম্মান করা।

৫. সারকথা

ফ্রি-মিক্সিং সভ্যতা স্বাধীনতার নামে মানুষকে প্রবৃত্তির দাস বানায়।
ইসলামি সভ্যতা মানুষকে হায়া, পবিত্রতা ও মর্যাদা দিয়ে স্বাধীন করে।

আল্লাহ বলেন:

يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

"আল্লাহ চান তোমাদের জন্য স্পষ্ট করতে, তোমাদের পূর্ববর্তীদের পথ দেখাতে এবং তোমাদের তাওবা কবুল করতে। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।" [সূরা নিসা: ২৬]

"ফ্রি-মিক্সিং" মানে গায়রে মাহরাম নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা, কোনো শরয়ী সীমানা ছাড়াই একসাথে কাজ, আড্ডা, পড়াশোনা, অনুষ্ঠান করা। পশ্চিমা "আধুনিক সভ্যতা" এটাকে স্বাভাবিক ও প্রগতির চিহ্ন বলে, কিন্তু ইসলামের দৃষ্টিতে এটা ফিতনার বড় দরজা।

১. ইসলাম কী বলে?

ইসলাম নারী-পুরুষের মেলামেশা পুরোপুরি বন্ধ করেনি, বরং নিয়ন্ত্রিত করেছে।

কুরআনের মূলনীতি:

1. *দৃষ্টি অবনত রাখা:*

قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ
قُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ

[সূরা নূর: ৩০-৩১]

চোখই ফিতনার প্রথম ধাপ। তাই প্রথমে দৃষ্টির হেফাজত।

2. *কথায় কোমলতা বর্জন:*

فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ

"তোমরা কোমল স্বরে কথা বলো না, যাতে যার অন্তরে ব্যাধি আছে সে লালসা করে।" [সূরা আহযাব: ৩২]

3. *পৃথক থাকার নির্দেশ:*

وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ

"তোমরা যখন তাদের কাছে কিছু চাইবে, পর্দার আড়াল থেকে চাইবে।" [সূরা আহযাব: ৫৩]

এটা নবী ﷺ এর স্ত্রীদের জন্য নাজিল হলেও উম্মতের জন্য আদর্শ।

হাদিস:
রাসূল ﷺ বলেন, "কোনো পুরুষ যেন কোনো নারীর সাথে নির্জনে না থাকে, মাহরাম ছাড়া।" [বুখারী: ৫২৩]
"আমি পুরুষদের জন্য নারীদের চেয়ে বড় কোনো ফিতনা রেখে যাইনি।" [বুখারী: ৫০৯৬]

২. ফ্রি-মিক্সিং এর ক্ষতি

ইসলাম শুধু "হারাম" বলে থামে না, এর পেছনের হিকমত দেখায়।

ব্যক্তিগত ক্ষতি:
- *অন্তরের রোগ:* অবাধ মেলামেশায় অন্তরে গুনাহের আকর্ষণ বাড়ে, লজ্জা কমে যায়।
- *চোখ-অন্তরের যিনা:* রাসূল ﷺ বলেন, "চোখের যিনা হলো তাকানো, কানের যিনা হলো শোনা।" [মুসলিম: ২৬৫৭]
- *মানসিক অশান্তি:* হারাম সম্পর্ক, হতাশা, আত্মসম্মানহানি।

সামাজিক ক্ষতি:
- *ব্যভিচার ও পরকীয়ার বিস্তার:* ফ্রি-মিক্সিং ব্যভিচারের দিকে ধীরে ধীরে নিয়ে যায়। আল্লাহ বলেন, "তোমরা ব্যভিচারের ধারে-কাছেও যেও না।" [সূরা ইসরা: ৩২]
- *পরিবার ভাঙন:* স্বামী-স্ত্রীর মাঝে সন্দেহ, বিশ্বাসহীনতা।
- *নারীর মর্যাদাহানি:* নারীকে ব্যক্তিত্বের বদলে সৌন্দর্যের পণ্য বানিয়ে ফেলে।

৩. "কিন্তু কাজ-পড়াশোনায় তো মিশতে হয়?"

ইসলাম প্রয়োজন অস্বীকার করে না। ডাক্তারি, শিক্ষা, ব্যবসার জন্য মেলামেশা লাগলে শর্তসাপেক্ষে জায়েজ:

1. *প্রয়োজন সীমিত থাকবে:* অপ্রয়োজনীয় আড্ডা, হাসি-ঠাট্টা নয়।
2. *পর্দা বজায় থাকবে:* নারী-পুরুষ উভয়ের শরয়ী পর্দা।
3. *একাকী নির্জনতা নয়:* বন্ধ রুমে দুজন একা নয়।
4. *নিয়ত শুদ্ধ থাকবে:* কাজের জন্য, ফিতনার জন্য নয়।

সাহাবিয়ারা মসজিদে, বাজারে, যুদ্ধে যেতেন, কিন্তু পর্দা ও শালীনতা বজায় রেখে।

৪. ইসলামি বিকল্প কী?

ইসলাম বলে: আলাদা করো, কিন্তু বঞ্চিত করো না।
- নারীদের জন্য আলাদা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, কর্মক্ষেত্র।
- প্রয়োজনে পর্দা মেনে কাজ করা।
- সমাজে হায়া ও লজ্জাশীলতাকে সম্মান করা।

৫. সারকথা

ফ্রি-মিক্সিং সভ্যতা স্বাধীনতার নামে মানুষকে প্রবৃত্তির দাস বানায়।
ইসলামি সভ্যতা মানুষকে হায়া, পবিত্রতা ও মর্যাদা দিয়ে স্বাধীন করে।

আল্লাহ বলেন:

يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

"আল্লাহ চান তোমাদের জন্য স্পষ্ট করতে, তোমাদের পূর্ববর্তীদের পথ দেখাতে এবং তোমাদের তাওবা কবুল করতে। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।" [সূরা নিসা: ২৬]

৩,কর্মক্ষেত্রে ফ্রি -মিক্সিং এর প্রভাব:

ফ্রি-মিক্সিং সভ্যতা

নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা, যা পশ্চিমের নারীমুক্তি ও নারী অধিকারের স্লোগানের প্রাণ, তা ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গির একেবারে বিপরীত। নারীরা যখন উপার্জনের জন্য ঘর থেকে বের হয়, তখন পুরুষদের সাথে কাজ করার কারণে ধীরে ধীরে তাদের লজ্জা ও শালীনতা বিদায় নেয়। প্রথমে বোরকা খুলে ফেলে,

তারপর চাদর বাদ দেয় এবং তারপর মাথা খালি হওয়া শুরু হয়। এভাবে ক্রমাগত ছাড়, গলা ও হাত উন্মুক্ত হয়ে যায়। তারপর শুরু হয় ছোট ছোট জামাকাপড়, গয়না, মেকআপ, ফ্যাশন ও সাজসজ্জার এক নির্লজ্জ প্রতিযোগিতা। নারীরা নিজেদের উপার্জনের বেশিরভাগ তাদের নিজেদের পোশাক, গয়না ও মেকআপের পেছনেই উড়িয়ে দেয়।

অন্যদিকে এর কারণে সমাজে অশ্লীলতা ও নির্লজ্জতার বন্যা বয়ে যায়। লম্পট দৃষ্টিগুলো এলোমেলো নিক্ষেপ হতে থাকে এবং ছিনালি ও বেহায়াপনা শুরু হয়। তারপর নারীরা অভিযোগ করে যে, পুরুষেরা আমাদের উত্ত্যক্ত করে। কথা হলো, আপনি নিজেই যেখানে উত্ত্যক্ত করার দাওয়াত দিচ্ছেন, সেখানে দোষটা পুরুষদের ঘাড়ে কেন চাপাচ্ছেন? নিজের আচরণ ও কর্মপন্থার ওপরও তো কিছুটা মনোযোগ দেওয়া দরকার! আপনিই নিজের অবস্থা নিয়ে একটু চিন্তা করুন। আমরা কিছু বললে তো অভিযোগ হয়ে যাবে!

এমন নারীদের জন্যই নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةً أَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ

‘আমার পর পুরুষদের জন্য নারীদের চেয়ে অধিক ক্ষতিকর কোনো ফিতনা রেখে যাইনি।’৭৫

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ، فَإِذَا خَرَجَتْ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ

‘নারী পর্দায় থাকার জিনিস। যখন সে ঘর থেকে বের হয়, শয়তান তার দিকে উঁকি মেরে তাকাতে থাকে।’৭৬

দপ্তর, দোকান, কারখানায় পরপুরুষদের সাথে কাজ করা, তাদের সেক্রেটারি হওয়া এবং তাদের সেবা করা—এসবের নামই কি নারী উন্নয়ন? আধুনিক যুগের চাহিদা কি এই যে, ঘরে থেকে নিজের স্বামী ও সন্তানদের সেবা করা যাবে না? ঘরের চারদেয়ালের মাঝে থাকা আর জেলখানায় থাকা বরাবর! এসব সেকেলে কাজকর্ম ও প্রাচীন রীতিনীতি!

৭৫ সহিহ বুখারি, হাদিস নং ৫০৯৬; সহিহ মুসলিম, হাদিস নং ২৭৪০
৭৬ সুনানে তিরমিজি, হাদিস নং ১৭৩; মুসনাদে বাযযার, হাদিস নং ২০৬১

কোনো নারী যদি বিমানের এয়ার হোস্টেজ হয়ে ৪০ মানুষকে খাবার খাওয়ায়, তাদের সামনে ট্রে সাজিয়ে নিয়ে যায় আর এই ৪০ জোড়া কামুক দৃষ্টির নিশানায় পরিণত হয়; অথবা কোনো নারী হোটেলে ওয়েট্রেস হয়ে কারও সেবা করে, কারও পার্সোনাল সেক্রেটারি হয়, টেলিফোন অপারেটর হয়, স্টেনোগ্রাফার হয়ে যায়, কল গার্ল হয়, সিঙ্গার বা ফিল্মস্টার হয়ে দর্শক-শ্রোতাদের মন মাতায়, মডেল গার্ল হয়ে দেহের প্রদর্শনী করে oবেড়ায়—এ সবকিছু নারী উন্নয়ন আর ঘরে স্বামী-সন্তানের জন্য কাজ করা পশ্চাৎপদতা! প্রজ্ঞার নাম পাগলামি আর পাগলামির নাম রেখেছে প্রজ্ঞা, আপনার মনমতো আপনি কারিশমা দেখাবেন!

আজকের বস্তুবাদি সভ্যতা অর্থ ও টাকা-পয়সাকেই সবকিছু মনে করে। বেতন ও সমানাধিকারের লোভে একজন নারী ঘরের বাইরে যে সময় ব্যয় করে, তাতে কোনো কল্যাণ ও উন্নতি থাকে না, থাকে না কোনো প্রশান্তি ও স্বস্তি। অন্যদিকে একজন মুমিন নারী নিজের ঘরে নিজের স্বামী-সন্তানের পেছনে যে সময় ব্যয় করে, তা তার জীবনের শ্রেষ্ঠ সময় এবং তার জন্য অবিমিশ্র শান্তি, আরাম ও প্রশান্তির উৎস। এরপর প্রকৃত পুরস্কার তো আল্লাহ তাআলা দেবেন।

তবে হ্যাঁ, যদি কোনো নারী বাস্তবিক অপারগতার দরুন পর্দা ও হিজাবের সীমানা রক্ষা করে কাজ করে, তাহলে ইসলাম তার ওপর কোনো তিরস্কার ও নিন্দা করে না; বরং এমন নারীও আল্লাহ তাআলার নিকট সওয়াব ও প্রতিদানের হকদার।

ইসলামি কর্মক্ষেত্র vs ফ্রি-মিক্সিং কর্মক্ষেত্র - মূল পার্থক্য

১. মেলামেশার নীতি
- *ইসলামি:* প্রয়োজন ছাড়া নারী-পুরুষ আলাদা। কথা-বার্তা শুধু কাজের মধ্যে সীমিত।
- *ফ্রি-মিক্সিং:* নারী-পুরুষ অবাধে মেলামেশা করে। আড্ডা-হাসি-ঠাট্টা স্বাভাবিক।

২. পর্দা
- *ইসলামি:* নারী-পুরুষ উভয়ের শরয়ী পর্দা বাধ্যতামূলক। চোখ, কণ্ঠ, পোশাকের হেফাজত।
- *ফ্রি-মিক্সিং:* পর্দা নেই বা শুধু ফর্মালিটি। আকর্ষণীয় পোশাক, মেকআপ উৎসাহিত করা হয়।

৩. কথাবার্তা
- *ইসলামি:* গাম্ভীর্য বজায় রেখে প্রয়োজনীয় কথা। কোমলতা, ন্যাকামি নিষেধ।
- *ফ্রি-মিক্সিং:* কোমল স্বর, ফ্লার্টিং, পার্সোনাল কথা বলা সাধারণ বিষয়।

৪. পরিবেশ
- *ইসলামি:* হায়া, শালীনতা, লজ্জাশীলতাকে সম্মান করা হয়।
- *ফ্রি-মিক্সিং:* হায়াকে "ব্যাকডেটেড" মনে করা হয়। খোলামেলা আচরণকে প্রফেশনালিজম বলা হয়।

৫. উদ্দেশ্য
- *ইসলামি:* কাজ শেষ করে দ্রুত বের হওয়া। ফিতনা এড়ানো।
- *ফ্রি-মিক্সিং:* নেটওয়ার্কিং, সম্পর্ক তৈরি, সামাজিকীকরণও কাজের অংশ।

৬. ফিতনার ঝুঁকি
- *ইসলামি:* কম, কারণ সীমানা স্পষ্ট।
- *ফ্রি-মিক্সিং:* বেশি, কারণ ধীরে ধীরে হারাম সম্পর্কে গড়ায়।

৭. নারীর ভূমিকা
- *ইসলামি:* যোগ্যতা ও পর্দা বজায় রেখে কাজ করা। ব্যক্তিত্বকে মূল্যায়ন।
- *ফ্রি-মিক্সিং:* প্রায়শই সৌন্দর্য ও উপস্থিতিকে প্রাধান্য দেওয়া হয়।

৮. ফলাফল
- *ইসলামি:* মানসিক শান্তি, ফ্যামিলি স্টেবিলিটি, গুনাহ থেকে বাঁচা।
- *ফ্রি-মিক্সিং:* মানসিক অশান্তি, পরকীয়া, পরিবার ভাঙন, আত্মসম্মানহানি।

৯. ইসলামি দলিল
- **সূরা আহযাব: আয়াত ৩২*

আরবি:
يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ ۚ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا

অর্থ:
হে নবীর স্ত্রীগণ! তোমরা অন্য নারীদের মতো নও। যদি তোমরা আল্লাহকে ভয় করো, তবে পরপুরুষের সাথে কোমল স্বরে কথা বলো না, যাতে যার অন্তরে রোগ আছে সে লালসা করে। আর তোমরা সঙ্গত কথা বলো।

সূরা আহযাব: আয়াত ৫৩

আরবি:

وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ ۚ ذَٰلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ

অর্থ:
আর তোমরা যখন তাদের [নবী ﷺ এর স্ত্রীদের] কাছে কোনো জিনিস চাইবে, তখন পর্দার আড়াল থেকে চাইবে। এটা তোমাদের অন্তর ও তাদের অন্তরের জন্য অধিক পবিত্র।

- *ফ্রি-মিক্সিং:* কুরআন-সুন্নাহয় নিষেধ করা হয়েছে। রাসূল ﷺ বলেছেন: "নারী-পুরুষ একা থাকা শয়তানের কাজ" [তিরমিজি]

৩,পরকীয়া:

পরকীয়া - ইসলামের দৃষ্টিতে

পরকীয়া মানে বিবাহিত হওয়া সত্ত্বেও স্বামী/স্ত্রী ছাড়া অন্য কারও সাথে অবৈধ প্রেম, শারীরিক সম্পর্ক বা মানসিক আসক্তি। ইসলামে এটা কবিরা গুনাহ এবং সমাজ ধ্বংসের বড় কারণ।

১. হুকুম কী?

কুরআন:
> "তোমরা ব্যভিচারের ধারে-কাছেও যেও না। নিশ্চয়ই এটা অশ্লীল কাজ ও মন্দ পথ।"
> [সূরা ইসরা: ৩২]

পরকীয়া যেহেতু ব্যভিচারের মধ্যেই পড়ে, তাই এটা হারাম। বিবাহিত হলে শাস্তি আরও কঠোর।

হাদিস:
রাসূল ﷺ বলেন,
"কোনো বিবাহিত পুরুষ বা নারী ব্যভিচার করলে তাদের শাস্তি হলো পাথর মেরে মৃত্যুদণ্ড।"
[মুসলিম: ১৬৯০]

২. পরকীয়ার ধাপগুলো

ইসলাম শুধু শেষ কাজটাকে হারাম বলেনি, এর দিকে নিয়ে যায় এমন সব পথও বন্ধ করেছে:

1. *দৃষ্টি:* গায়রে মাহরামের দিকে শাহওয়াতের সাথে তাকানো হারাম। [নূর: ৩০-৩১]
2. *কথা:* কোমল, ফ্লার্টিং, রাত জেগে চ্যাট করা। [আহযাব: ৩২]
3. *নির্জনতা:* দুজন একা থাকা। "কোনো পুরুষ যেন কোনো নারীর সাথে নির্জনে না থাকে, মাহরাম ছাড়া।" [বুখারী: ৫২৩]
4. *শারীরিক স্পর্শ:* হাত ধরা, জড়িয়ে ধরা সবই হারাম।
5. *শেষ ধাপ:* ব্যভিচার।

৩. কেন হয় পরকীয়া?

ব্যক্তিগত কারণ:
- আল্লাহর ভয় ও ঈমান দুর্বল হয়ে যাওয়া
- পর্দা, দৃষ্টি হেফাজত না করা
- ফ্রি-মিক্সিং পরিবেশে কাজ করা, সোশ্যাল মিডিয়ায় অবাধ চ্যাট
- স্বামী-স্ত্রীর মাঝে দূরত্ব, অবহেলা, মানসিক তৃপ্তির অভাব
- পর্ন, নাটক-সিনেমার প্রভাব

১. পরকীয়া কেন শুরু হয় - মনস্তাত্ত্বিক দিক

পরকীয়া হুট করে হয় না। এটা ৪টা ধাপে এগোয়:

1. *আবেগীয় শূন্যতা:* বাসায় মানসিক সাপোর্ট না পাওয়া। "বাসায় কেউ বোঝে না" - এই ফিলিং।
2. *সুযোগ ও সীমানা ভাঙা:* অফিসের কলিগ, পুরনো বন্ধু, ফেসবুকের ইনবক্স। প্রথমে "জাস্ট ফ্রেন্ড" দিয়ে শুরু।
3. *গোপনীয়তা ও মিথ্যা:* ছোট ছোট মিথ্যা বলা শুরু হয়। ফোন লুকানো, দেরি করে ফেরা।
4. *আসক্তি:* মস্তিষ্কে ডোপামিন রিলিজ হয়। হারাম সম্পর্ক নেশার মতো হয়ে যায়।

সামাজিক কারণ:

- বিয়েকে কঠিন করা, হারামকে সহজ করা
- পরকীয়াকে "অধিকার", "ভালোবাসা" বলে নরমালাইজ করা

৪. ক্ষতি কী হয়?

ব্যক্তিগত:
- অন্তরে অশান্তি, অপরাধবোধ, মানসিক যন্ত্রণা
- আল্লাহর রহমত থেকে দূরে সরে যাওয়া
- আত্মসম্মান নষ্ট হওয়া

- অন্তরের মৃত্যু: গুনাহ করতে লজ্জা চলে যায়।
- বারাকাহ চলে যায়: রিজিক, সময়, সুখ থেকে বরকত উঠে যায়।
- মৃত্যুর সময় খারাপ পরিণতির আশঙ্কা।
*

পারিবারিক:*
- স্বামী-স্ত্রীর মাঝে বিশ্বাস ভেঙে যায়
- সন্তানরা মানসিকভাবে ভেঙে পড়ে
- সংসার ভেঙে যায়, তালাক হয়
- সন্তানরা হয় বখাটে, নয়তো চরম মানসিক রোগী হয়। গবেষণা বলে, ভাঙা পরিবারের সন্তানদের ডিপ্রেশন ৩ গুণ বেশি।
- আত্মীয়-স্বজনের মাঝে অপমান, সম্পর্ক ছিন্ন।
- সম্পত্তি, মামলা-মোকদ্দমায় জীবন শেষ।

সামাজিক:
- বংশপরিচয় নষ্ট হয়
- সমাজে অশ্লীলতা ছড়ায়
- হত্যা, আত্মহত্যার মতো ঘটনা ঘটে

- বংশপরিচয় গুলিয়ে যায়। এটাই ইসলামে সবচেয়ে বড় ক্ষতি।
- যিনা ছড়ালে প্লেগ, এইডসের মতো মহামারি আসে - হাদিসে আছে।

৫. সমাধান ও বাঁচার উপায়
অংশ ১: পরকীয়া থেকে বাঁচতে স্বামী-স্ত্রীর করণীয়

বিয়ে মানে একে অপরের হেফাজত। দুজন চেষ্টা করলে ৯০% ফিতনা বন্ধ হয়ে যায়।

১. আবেগ ও সময়ের ভাগাভাগি
- *স্বামী:* দিনে ১৫-৩০ মিনিট শুধু স্ত্রীর জন্য রাখো। কথা শোনো, সমাধান না দিলেও চলে।
- *স্ত্রী:* স্বামীর মানসিক চাপ বোঝো। বাড়ি ফিরলে শান্তির পরিবেশ দাও।
কারণ: বাইরে কেউ "বোঝে" মনে হলেই মানুষ আটকে যায়।

২. শারীরিক ও মানসিক চাহিদা পূরণ

- লজ্জা না করে খোলাখুলি বলো। "বাইরে থেকে পেলে সমস্যা নেই" - এই মনোভাবই ধ্বংস আনে।
- রাসূল ﷺ নিজে স্ত্রীদের সাথে হাসি-ঠাট্টা, খেলাধুলা করতেন। এটাও সুন্নাহ।

৩. বিশ্বাস তৈরি করো, সন্দেহ নয়

- অযথা মোবাইল চেক করলে সম্পর্ক নষ্ট হয়।
- আবার উদাসীন থাকলেও বিপদ। মাঝামাঝি পথ: স্বচ্ছতা রাখো।

৪. ফ্রি-মিক্সিং ও একাকীত্ব এড়াও

- অফিস, ফেসবুকে গায়রে মাহরামের সাথে অপ্রয়োজনীয় চ্যাট বন্ধ করো।
- "উনি তো কলিগ" - এটাই শয়তানের প্রথম ফাঁদ। অপ্রয়োজনীয় মেলামেশা বন্ধ।

৫. একসাথে দীন চর্চা করো

- একসাথে নামাজ, কুরআন পড়ো। যে ঘরে জিকির হয়, শয়তান সেখানে টিকে না।

৬. ছোট ছোট যত্ন

- "তোমার জন্য দোয়া করি" লিখো। ভুল হলে "সরি" বলো। ইগো সংসার ভাঙে।

৭. দোয়া করো

প্রতিদিন পড়ো:

رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ

"হে রব! আমাদের স্ত্রী ও সন্তানদের চোখের শীতলতা বানিয়ে দাও" [ফুরকান: ৭৪]

হে আল্লাহ আমাকে হারাম থেকে বাঁচাও।হালাল দিয়ে সন্তুষ্ট করো।

৮ *তাওবা:* আন্তরিকভাবে আল্লাহর কাছে ফিরে আসা। আল্লাহ ক্ষমাশীল। "নিশ্চয়ই আল্লাহ তাওবাকারীদের ভালোবাসেন।" [বাকারা: ২]

৯*দৃষ্টি হেফাজত:* চোখই ফিতনার প্রথম দরজা।

১০ *বিবাহিত জীবনে মনোযোগ:* স্বামী-স্ত্রী একে অপরকে সময় দেওয়া, কথা বলা, ভালোবাসা প্রকাশ করা।
১১, *সৎ সঙ্গ:* যারা আল্লাহকে ভয় করে তাদের সাথে থাকা।

৬. *যদি হয়ে যায়!!*
৪. **বাঁচার উপায় - প্র্যাক্টিক্যাল রোডম্যাপ**
*
ক. *নিজেকে হেফাজত করা*

1. *দৃষ্টি কন্ট্রোল:* ফোনে ফিল্টার লাগাও। রাস্তায় চোখ নিচু রাখো। সোশ্যাল মিডিয়া আনফলো করো।
2. *ফ্রি টাইম কিল করো:* বেকার সময় শয়তানের খেলার মাঠ। কুরআন, বই, স্কিল শেখো।
3. *রোজা রাখো:* রাসূল ﷺ বলেছেন, যার বিয়ে করার সামর্থ্য নেই সে যেন রোজা রাখে। এটা কামভাব কমায়।
4. *পরিবেশ বদলাও:* যেখানে ফিতনা, সেখান থেকে সরে আসো। চাকরি বদলাতেও হতে পারে।

খ. *বৈবাহিক জীবন মেরামত করা*

1. *সাপ্তাহিক ডেট:* সন্তানদের নানী-দাদীর কাছে রেখে ২ ঘণ্টা শুধু দুজন বাইরে যাও।
2. *প্রশংসা করো:* দিনে ১টা ভালো জিনিস বলো। "আজ তোমার রান্না ভালো হয়েছে", "তুমি কষ্ট করো বুঝি"।
3. *শারীরিক স্পর্শ:* দিনে ১ বার জড়িয়ে ধরা, হাত ধরা। এটা অক্সিটোসিন বাড়ায়, মানসিক বন্ডিং হয়।

4. *ঝগড়ার নিয়ম বানাও:* রাতে ঝগড়া করে ঘুমানো যাবে না। যাই হোক, "সরি" বলে শেষ করো।

গ. *আল্লাহর সাথে সম্পর্ক মজবুত করা*

1. *তাহাজ্জুদ:* রাত ৩টায় উঠে ২ রাকাত পড়ো। এই সময় দোয়া কবুল হয়।
2. *জিকির:* "লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ" - শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে বাঁচায়।
3. *সদকা:* গোপনে দান করো। গুনাহ মোচন হয়।

৫. *যদি হয়ে যায় - তাওবার সঠিক পদ্ধতি*

শুধু "আস্তাগফিরুল্লাহ" বললেই হয় না। খালেস তাওবার ৪ শর্ত:

1. *গুনাহ ছেড়ে দেওয়া:* সাথে সব যোগাযোগ বন্ধ।
2. *অনুতপ্ত হওয়া:* অন্তর থেকে লজ্জিত হওয়া।
3. *আর না করার দৃঢ় সংকল্প:* "আর কখনো না" - এই নিয়ত।
4. *হকের প্রতিদান:* যদি কারও হক নষ্ট হয়, সেটা ফেরত দাও।

আল্লাহ বলেন:
> "নিশ্চয়ই আল্লাহ তাওবাকারী ও পবিত্রতা অর্জনকারীদের ভালোবাসেন" [বাকারা: ২]

গুনাহ প্রকাশ কোরো না। রাসূল ﷺ বলেছেন, "যে নিজের গুনাহ গোপন রাখে, আল্লাহ কিয়ামতে তা গোপন রাখবেন"।

৬. *সমাজ হিসেবে আমাদের দায়িত্ব*

- বিয়েকে সহজ করো। মোহরানা কমাও, অনুষ্ঠান ছোট করো।
- যুবক-যুবতীর হাল পরিচয়ের ব্যবস্থা করো।

- ফ্রি-মিক্সিং স্কুল, অফিসকে প্রশ্ন করো। চুপ থাকলে সয়ে যাবে।
- সন্তানদের ১০ বছর বয়স থেকেই হায়া, পর্দা শেখাও।

শেষ কথা:
পরকীয়া একটা ফাঁদ। শয়তান বলে "একবারই তো", তারপর বলে "এখন তো হয়েই গেছে"।
কিন্তু আল্লাহর রহমত তার শাস্তির চেয়ে বড়। ফিরে আসো এখনই।

পরকীয়া এক মুহূর্তের মজা, কিন্তু সারা জীবনের আফসোস। আল্লাহ আমাদের হেফাজত করুন।

র্নিলজ্জ পশ্চিমা নারীদের অন্ধ অনুসরণ :

একজন মুমিন নারীর কাছে সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ, তার ইজ্জত-আব্রু। জীবনের বিনিময়ে হলেও সে এর হেফাযত করে। কিন্তু একজন পশ্চিমা নারী! সামান্য রুটির জন্য সে তার সবচেয়ে মূল্যবান বস্তু ইজ্জত-আব্রু বিলিয়ে দিচ্ছে।

পশ্চিমাদের চাকচিক্য দেখে অনেকেই মনে করে,
তারা খুব সুখী। আসলে তারা সুখে
নেই।” “অন্তরের
গহীনে লুকানো বেদনা তাদের অনেক বেশি। পুরুষদের চেয়ে পশ্চিমা নারীরা আরও বেশি কষ্টে আছে।”

- *পুঁজিপতিদের ফাঁদ:* এই দুর্দশার কারণ
হলো—“তাঁদেরকে বাজারের পণ্য
বানিয়ে ছেড়েছে পুঁজিপতি।”

অনেক নারী "বুঝে কিংবা না-বুঝে সে ফাঁদে পা দিয়েছে। আর জীবনকে ঠেকিয়ে দিয়েছে মরুভূমির অথই
চোরাবালিতে।"

প্রিয় বোন! মুসলিম নারী নিজেকে হেফাযত করেছে ; হেজাব গ্রহণ করেছে। ফলে সে সম্মানিত ও দামী হয়েছে। পর্দার বিধানকে আপন করেছে, অন্যায় সম্পর্ক থেকে বিরত থেকেছে। ফলে পুরুষই তাকে খোঁজ করে ফিরছে, তার জন্য পয়গাম পাঠাচ্ছে। মোটা অংকের মোহর পরিশোধ করে তাকে জীবনসঙ্গীনী বানাচ্ছে। আর পশ্চিমা নারী নিজেকে প্রদর্শন করেছে ও সহজলভ্য করেছে। ফলে সে লাঞ্ছিত ও অপদস্থ হয়েছে। কারণ, সহজলভ্য প্রতিটি বস্তই মূল্যহীন।

প্রথম যুগের আরব কবিদের অবস্থা ছিল, তাদের সামনে যদি নারীর হাতের তালু ও কব্জিটুকুও প্রকাশ পেত তাহলে তাদের হৃদয়ে তরঙ্গ খেলে যেত, দেহ-আত্মায় প্রেমের স্পন্দন জেগে উঠত, যবান কবিতা-সচল হত, শব্দ-ছন্দের ঝর্ণা প্রবাহিত হত। কারণ, আরব নারী থাকত হেজাবে ঢাকা, পরপুরুষের দৃষ্টির আড়ালে। আর পশ্চিমা নারী! সী-বীচে তার উপর-নিচ সব থাকে উন্মুক্ত। পুরুষ তার পায়ের গোছার দিকে তাকায়, কিন্তু তা তার মনে কোনো প্রভাব ফেলে না। হৃদয়কে নাড়া দেয় না। স্পন্দিত হওয়ার কোনো উপকরণ সেখানে সে খুঁজে পায় না। নারীর পায়ের গোছা আর চেয়ারের পায়া যেন একসমান!

আর এ কারণেই তাদের সমাজে বিয়ের বাজার মন্দা। বিবাহ তো আজীবনের বন্ধন। নারী-পুরুষ সে বন্ধনে আবদ্ধ হয়। এর মাধ্যমে তারা তাদের বিশেষ চাহিদা পূরণ করে। আর সেটিই বিবাহের প্রথম আকর্ষণ। এখন সে সমাজে যখন বন্ধন থেকে মুক্ত থেকেই চাহিদা মেটানো যায়, তখন কেন একজন পুরুষ বিবাহনামক বন্ধনে আবদ্ধ হতে যাবে, নিজেকে সে ঝামেলায় জড়াবে? (এমনই একটি কথা তাদের অনেকে বলে থাকে - "যখন সহজে দুধ কিনতে পারছ, তাহলে কেন খামোখা গোটা গাভী কিনতে যাবে?")

আজ পশ্চিমা নারী বিবাহের মত পবিত্র বন্ধন থেকে বঞ্চিত। ফলে সে হারিয়েছে পরিবার ও তার ভরণ-পোষণের দায়িত্বশীলকে। বঞ্চিত হয়েছে জীবিকার নিরাপত্তা

থেকে, মাথার উপরের নিরাপদ ছায়া থেকে। ফলে জীবন ধারণের জন্য সে গ্রহণ করেছে সব ধরণের পেশা, হীন থেকে হীনতর কাজ। সে আজ কারখানার শ্রমিক, রোদে খাটা কৃষক, পথের ঝাড়ুদার! আমাদের বন্ধুরা যারা ইউরোপে থেকেছেন, তারা সেখানে নারীদেরকে পাবলিক টয়লেটও পরিষ্কার করতে দেখেছেন। আর কিছু নারী আছে যারা জুতা পালিশের কাজ করে। একটি বাক্স বহন করে এবং সারাদিন ফুটপাথে থাকে। এদের কাউকে কাউকে দেখা যায় সাথে বই, কাস্টমারের ফাঁকে ফাঁকে পরীক্ষার প্রস্তুতি নিচ্ছে। কোনো লোক এসে তার দিকে পা বাড়িয়ে দিলে সে বই ছেড়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ছে জুতা পালিশে। এই তো পশ্চিমা নারীর মর্যাদা ও স্বাধীনতার সাতকাহন। এদিকে মুসলিম নারী নিজগৃহে অবস্থান করে, আর পুরুষ মাথার ঘাম পায়ে ফেলে তার ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করে।

একজন মুসলিম নারী যখন বিবাহের বয়সে উপনীত হয় তখন পুরুষ তার জন্য প্রস্তাব পাঠায় এবং তার পর্যন্ত পৌঁছতে মোটা অংকের মোহর পরিশোধ করে। স্বামী প্রদত্ত এ সম্পদ নারীর একার, এর একমাত্র মালিক সে। এতে তার অনুমতি ব্যতীত আপন পিতা, ভাই বা স্বামী কারো হস্তক্ষেপের কোনো অধিকার নেই। আর পশ্চিমা নারী! তার নিজেকেই ছুটতে হয় পুরুষ সঙ্গীর খোঁজে। তারপর ঐ পুরুষ পর্যন্ত পৌঁছতে তাকে পঞ্চাশ হোঁচট খেতে হয়। কখনো কখনো এমন তীব্র হোঁচট খায় যে, এক হোঁচটেই সবকিছু খোয়াতে হয়, এমনকি জীবনটা পর্যন্ত! এতকিছুর পর যদিওবা তার পর্যন্ত পৌঁছতে সক্ষম হয়, বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার জন্য তাকে গুণতে হয় মোটা অংকের অর্থ। যেন স্ত্রী স্বামীকে মোহর দিয়ে বিবাহ করছে! এরপর থাকলো স্ত্রীর সম্পদ। সেখানেও তার একচ্ছত্র কর্তৃত্ব চলবে না। স্বামীও হস্তক্ষেপ করবে তার সম্পদে। আর মুসলিমনারীর সম্পদ! একমাত্র তার, কারো হস্তক্ষেপ চলবে না তার সম্পদে।

প্রিয় বোন! তুমি হয়ত বলবে, এটা অনেক আগের কথা। আমাদের এখানেও এখন বিবাহের বাজার মন্দা এবং অবিবাহিতা নারীর সংখ্যা অনেক। কথা ঠিক। কিন্তু ভেবে দেখেছ, কেন এমন হল?

কারণ, আমরা এখন পশ্চিমাদের অনুকরণ শুরু করেছি। ঐসকল বিষয়ে তাদের অনুকরণ করছি, যেগুলো থেকে মুক্তির পথ তারা খুঁজছে এবং তাদের ঐসকল বিষয় গ্রহণ করতে শুরু করেছি, যেগুলো থেকে তারা পালিয়ে বাঁচার চেষ্টা করছে। কারণ, ঔপনিবেশিকরা গত শতাব্দীতে - যখন আমরা ঘুমিয়ে ছিলাম এবং গাফেল ছিলাম - আমাদের মনে এই ধারণা বদ্ধমূল করে দিয়েছে যে, তারাই উন্নত, তারাই অগ্রগামী। তারা যা করছে সেটাই সঠিক। ফলে প্রতিটি বিষয়ে আমরা তাদের অন্ধ অনুকরণে মেতে উঠেছি; তাদের মত হতে পারাকেই পরম মোক্ষ লাভ মনে করছি!

কিন্তু আরব (আরবের মানুষের স্বভাব-প্রকৃতি) কি সকল বিষয়ে এমন অন্ধ অনুকরণ মেনে নিতে পারে? তা কি তাদের আত্মসম্মানে বাধে না?

আত্মসম্মানবোধ তো আরবদেরই বেশি থাকার কথা। একারণেই তো অসম্মানের ভেবে তারা আপন কন্যাকে জ্যান্ত পুঁতে ফেলত (যদিও সেটা ছিল আত্মসম্মানবোধ প্রকাশের এক ঘৃণ্য উপায়)। সে আরবরা কি এটা মেনে নেবে যে, অনুষ্ঠানে অপরিচিত কোনো লোক এসে বলবে, 'ইসমাহ লী' দয়া করে একটু দেবেন কি! কী দিবে? সিগারেট ধরানোর জন্য দিয়াশলাই? কয়টা বাজে দেখার জন্য হাত ঘড়িটা এগিয়ে ধরবে? না, বরং আপন স্ত্রীকে, ঐ লোকটার সাথে নাচার জন্য; তার বক্ষ ঐ পুরুষের বক্ষের সাথে মেলানোর জন্য, তার চেহারা ঐ অপরিচিত মানুষটির চেহারার কাছাকাছি নিয়ে, তার পা ওর পায়ের কাছে নিয়ে হাতে হাত ধরে নাচার জন্য!

কোনো আরব বা কোনো মুসলিম কি এটা মেনে নেবে? না, আত্মমর্যাদাশীল কোনো পুরুষই তা মেনে নেবে না। বরং প্রাণীকুলের মধ্যে নিকৃষ্ট খিনযীর ছাড়া অন্য কোনো প্রাণীও এটা মেনে নেবে না!

এটাই হল পশ্চিমা নারীর হালচিত্র। এবার বলুন, পশ্চিমা নারী এমন কী ভালোর মাঝে আছে, যা আমরা আমাদের নারীদের জন্য কামনা করতে পারি?
পশ্চিমা নারীরা তাদের মত চলুক, তাদের পুরুষরা তাদের জন্য যেটা কল্যাণকর মনে করে সেভাবেই চলুক। ওদের সাথে আমাদের কী সম্পর্ক? (ওদের তো আখেরাত বলে কিছু নেই। যাদের জীবনে আখেরাত-ভাবনা বলে কিছু নেই তাদের লাইফস্টাইল,

তাদের জীবন-ভাবনা আমরা গ্রহণ করতে পারি কীভাবে। মুসলিম নারী তো সফল হতে চায় দুনিয়াতে ও আখেরাতে। সুতরাং ওদের জীবন আমাদের জীবন সম্পূর্ণ আলাদা।) আমাদের স্ত্রীরা চলুক আল্লাহ যেভাবে চান সেভাবে। আমরা তাদের জন্য যেভাবে চলা কল্যাণকর মনে করি সেভাবে। যাতে আমরা শুধুই তাদের হই। তাদেরকে নিয়েই আমরা সন্তুষ্ট থাকি। আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ থাক শুধু তাদের দিকে, অন্য কোনো নারীর দিকে নয়।

হে বোন! শুনে রাখো, পৃথিবীতে আমাদের নারীরাই শ্রেষ্ঠ; যতক্ষণ তারা হেজাবের পাবন্দী করবে, ইসলামের আদাবের প্রতি গুরুত্ব দিবে, আরবের স্বভাব-চরিত্র আর ইসলামের আহকামকে আঁকড়ে ধরে থাকবে এবং ঐ সমাজের রীতি-নীতি আপন করে নিবে, যে সমাজ জন্ম দিয়েছে আয়েশা, আসমা, খানসা ও খাওলার মত অগণিত মহিয়সী নারী। জন্ম দিয়েছে আলেমা, ফকীহা, মুহাদ্দিস ও সাহিত্যিক। উপহার দিয়েছে সতীসাধ্বী দ্বীনদার মা, যাদের থেকে জন্ম নিয়েছে বীর-বাহাদুর; যুদ্ধের ময়দানের বীর, বক্তৃতার মেম্বারের অনলবর্ষী বক্তা, চিন্তার জগতের অগ্রনায়ক। রাজত্ব ও অর্থ যাদের পদচুম্বন করত। আর তারাই ছিল পৃথিবীর কর্তা। তাদের হাতেই ছিল অর্ধ পৃথিবীর রাজত্ব। আর তোমরা ছিলে হে বোন! ঐ সকল বীর-বাহাদুরের জন্মদাতা মা, রত্নগর্ভা মহিয়সী জননী।]

[1] [কারো থেকে যদি কোনো পাপ প্রকাশ পায়, উচিত হল তা গোপন করা। কারণ, পাপের এলান আরো বড় পাপ। কিন্তু এসকল লেখক আল্লাহকেও ভয় করে না এবং এদের চক্ষু লজ্জাও থাকে না। -প্রবন্ধকার (ঠিক একাজটিই আমাদের দেশের এফ এম রেডিওগুলোতে হচ্ছে; 'ফিজিক্যল রিলেশন' নামে যিনার এলান হচ্ছে। দেখার যেন কেউ নেই! -
লজ্জাশীলতা বজায় রাখা অনেক গুরুত্বপূর্ণ। লজ্জা থাকলে পরপুরুষের সাথে সম্পর্ক, তাদের সাথে কথাবার্তা বলা এবং তাদের দিকে তাকানোর মতো অনেক ফিতনা থেকে বেঁচে থাকা সম্ভব।

"নির্লজ্জ পশ্চিমা নারীদের অন্ধ অনুসরণ" — এই কথাটার পেছনে মূলত ৩টা জিনিস থাকে: ১. কী অনুসরণ করা হচ্ছে, ২. কেন সেটাকে "অন্ধ" বলা হচ্ছে, ৩. এর ফলাফল কী। বিস্তারিত দিচ্ছি:

১. *কী ধরনের অনুসরণের কথা বলা হয়*

পশ্চিমা নারীদের লাইফস্টাইল থেকে যেসব জিনিস বাংলাদেশ/মুসলিম সমাজে কপি হয়:

ক. পোশাক ও উপস্থাপন
- শরীর দেখানো পোশাক, টাইট ফিটিং, স্বল্পবসনকে "আধুনিকতা" ধরা।
- সোশ্যাল মিডিয়ায় নিজের শরীর/ব্যক্তিগত জীবন খোলামেলা দেখানোকে কনফিডেন্স বলা।

খ. সম্পর্ক ও পরিবার ধারণা
- ডেটিং, লিভ-ইন রিলেশনশিপ, বিয়ের আগের শারীরিক সম্পর্ককে নরমালাইজ করা।
- বিয়ে দেরিতে করা বা না করাকেই স্বাধীনতা বলা।
- ডিভোর্সকে সহজ সমাধান ধরা, সন্তানের মানসিক প্রভাব কম ভাবা।

গ. মূল্যবোধ ও অগ্রাধিকার
- ক্যারিয়ার আর সেলফ-ব্র্যান্ডিংকে একমাত্র সাফল্য ধরা। মাতৃত্ব, সংসারকে "ব্যাকডেটেড" বলা।
- "মাই বডি মাই চয়েস" নামে যেকোনো ব্যক্তিগত সিদ্ধান্তকে নৈতিক প্রশ্নের বাইরে রাখা।
- হায়া, লজ্জা, পর্দাকে দুর্বলতা হিসেবে দেখা।

ঘ. মিডিয়ার ভূমিকা
- সিরিজ, সিনেমা, ইনফ্লুয়েন্সাররা একই ধরনের লাইফস্টাইল গ্লোরিফাই করে।

- সমস্যা হলো, স্ক্রিনে যেটা ২ ঘণ্টায় দেখানো হয়, বাস্তবে তার ফল ২০ বছর ভোগ করতে হয়।

২. *কেন এটাকে "অন্ধ অনুসরণ" বলা হয়*

"অন্ধ" শব্দটা আসে কারণ:

1. *কারণ না জেনে কপি করা*: পশ্চিমে এই কালচার এসেছে শিল্প বিপ্লব, দুই বিশ্বযুদ্ধ, ধর্ম থেকে দূরে সরে যাওয়া, ফেমিনিজমের ৩টা ওয়েভের পর।
আমাদের সমাজের অর্থনীতি, ধর্ম, পরিবার কাঠামো আলাদা। কিন্তু কারণ না বুঝেই শুধু "ওরা করছে তাই আমিও করব" টাইপ মেন্টালিটি।

2. *নিজের সিস্টেমের ভালো দিক বাতিল করা*: ইসলামি/প্রাচ্যের পরিবার ব্যবস্থায় বড় পরিবার, সাপোর্ট সিস্টেম, বাচ্চা মানুষ করার কালচার ছিল। সেটাকে পুরনো বলে বাতিল করে দিয়ে পশ্চিমা নিউক্লিয়ার ফ্যামিলি নিলাম, কিন্তু তাদের সোশ্যাল সিকিউরিটি, ডে-কেয়ার সিস্টেম নিলাম না।

3. *ফল না দেখা*: পশ্চিমে এখন একাকীত্ব, ডিপ্রেশন, লোনলিনেস এপিডেমিক। ২০২3 সালের US Surgeon General এর রিপোর্ট বলে একাকীত্ব সিগারেটের মতোই ক্ষতিকর।
কিন্তু আমরা শুধু বাইরের চাকচিক্যটা দেখি, ভেতরের ভাঙনটা দেখি না।

৩. *এর দীর্ঘমেয়াদী ফলাফল কী হয়*

ব্যক্তিগত লেভেলে:
- সম্পর্ক অস্থায়ী হয়। কমিটমেন্টের ভয় তৈরি হয়।
- মানসিক অশান্তি বাড়ে। "সব আছে কিন্তু শান্তি নাই" ফিলিং।
- হায়া কমে গেলে লজ্জাবোধ মরে যায়, গুনাহ করা সহজ হয়ে যায়।

পারিবারিক লেভেলে:
- ডিভোর্স রেট বাড়ে। সন্তান সিঙ্গেল প্যারেন্টিংয়ে বড় হয়।
- বয়স্ক বাবা-মা ওল্ড হোমে যায়। পশ্চিমে এটা নরমাল, আমাদের সমাজে এটা ট্রমা।

সামাজিক লেভেলে:
- বিশ্বাস উঠে যায়। প্রতিবেশী, আত্মীয়ের সাথে দূরত্ব বাড়ে।
- জন্মহার কমে যায়। ইউরোপ-জাপানের মতো জনসংখ্যা ক্রাইসিস আসে।

৪. *ইসলামের ব্যালান্সড পজিশন কী*

ইসলাম "পশ্চিমা সব খারাপ" বলে না, "অন্ধভাবে কিছু নিও না" বলে।

নেওয়া যায়:
- শিক্ষা, গবেষণা, টেকনোলজি, ন্যায়বিচার, সময়ানুবর্তিতা। এগুলো তো ইসলামেরও শিক্ষা।
- নারীর শিক্ষা, সম্পত্তির অধিকার, ব্যবসার অধিকার — ইসলাম ১৪০ বছর আগেই দিয়েছে।

এড়ানো উচিত:
- যেটা হায়া, পর্দা, পরিবার কাঠামো, আকিদা ভাঙে।
- রাসূল ﷺ বলেছেন: "তোমরা ইহুদি-নাসারাদের এক বিঘত এক হাত অনুসরণ করবে... এমনকি তারা যদি গুইসাপের গর্তে ঢোকে তোমরাও ঢুকবে" [বুখারি: ৩৪৫৬]। এটা সতর্কতা, নিষেধ না।

হিকমা মুমিনের হারানো সম্পদ। যেখানে পাবে কুড়িয়ে নাও, কিন্তু যাচাই করে নাও।

৫. *তাহলে করণীয় কী*

1. *যাচাই করো*: যেকোনো ট্রেন্ড দেখলে জিজ্ঞাসা করো — এটা আমার দীন, পরিবার, মানসিক শান্তির জন্য উপকারী কি না?
2. *নিজের মডেল বানাও*: পশ্চিমা ফেমিনিজম না, ইসলামি ফেমিনিজম না — তুমি নিজে কুরআন-সুন্নাহর আলোকে নারী হিসেবে কেমন হতে চাও সেটা ঠিক করো।
3. *ভালোটা নাও, খারাপটা ছাড়ো*: পশ্চিমেও অনেক নারী এখন "ট্র্যাডিশনাল" লাইফস্টাইলে ফিরছে কারণ তারা দেখেছে লিবারেল লাইফস্টাইল শান্তি দেয় না।

মূল কথা: অন্ধ অনুসরণ মানে নিজের বিবেক, ধর্ম, বাস্তবতা বন্ধ করে রাখা। বুদ্ধিমানের কাজ হলো চোখ খোলা রেখে ভালোটা নেওয়া আর ক্ষতিকরটা ছেড়ে দেওয়া।

#স্ত্রীর প্রতি স্বামীর অবহেলা:

নারীর মন কাঁচের মতো অল্প আঘাতে ভেঙে চুরমার হয়ে যায়।নারীর মন বুঝতে পারলে তাঁর মনোযোগ কোন স্বামী অর্জন করতে পারলে নারী সেই স্বামীকে জীবন দিয়ে ভালোবাসে। নারী অভিমানী হয় অল্পতে বেশী কষ্ট পায়।নারীকে যদি স্বামী মানসিক ভাবে কষ্ট দেয় তাহলে সেই মনখারাপের প্রভাব শারীরিক সম্পর্ক সহ সংসারের প্রতি কোনায় তাঁর প্রভাব পড়বে।

-

স্বামীর ওপর স্ত্রীর হকসমূহ

১. স্ত্রীর সাথে সর্বদা ভালো আচরণ করা।

২. স্ত্রীর কোনো কথায় বা কাজে কষ্ট পেলে ধৈর্য ধারণ করা।

৩. উচ্ছৃঙ্খল, বেপর্দা চলাফেরা করতে থাকলে নম্র ভাষায় তাকে বোঝানো।
৪. সামান্য বিষয় নিয়ে স্ত্রীর সাথে ঝগড়া-বিবাদ না করা। কথায় কথায় ধমক না দেওয়া। রাগ না করা।

৫. স্ত্রীর আত্মমর্যাদায় আঘাত করে এমন বিষয়ে সংযত থাকা। শুধু শুধু স্ত্রীর প্রতি কুধারণা না করা। স্ত্রীর সম্পর্কে উদাসীন না থাকা।

৬. সামর্থ্যানুযায়ী স্ত্রীর খোরপোষ দেওয়া। অপচয় না করা।

৭. নামায পড়া এবং দ্বীনের আহকাম মেনে চলার জন্য উৎসাহ দিতে থাকা। হায়েয-নেফাসের মাসআলাগুলো ভালোভাবে শিক্ষা দেওয়া। শরীয়ত পরিপন্থী কাজ থেকে বিরত রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করা।

৮. একাধিক স্ত্রী থাকলে তাদের মাঝে সমতা রক্ষা করা।

৯. চাহিদানুযায়ী তাদের সাথে মেলামেশা করা।

১০. অনুমতি ব্যতীত আযল অর্থাৎ মেলামেশার সময় শেষ মুহূর্তে স্বাভাবিক স্থান ত্যাগ না করা।

১. একান্ত নিরুপায় না হলে তালাক না দেওয়া এবং প্রয়োজনের ক্ষেত্রে শরীয়ত-গৃহীত পন্থায় তালাক দেওয়া।

১২. প্রয়োজন মাফিক থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করা।

১৩. মাঝে মাঝে স্ত্রীর নিকটাত্মীয়দের সাথে দেখা-সাক্ষাত করার সুযোগ করে দেওয়া।

১৪. স্ত্রীর সাথে মেলামেশার চিত্র অন্যের কাছে বর্ণনা না করা।

১৫. প্রয়োজনে স্ত্রীকে শাসন করা। সতর্ক করা। শরীয়ত যতটুকু অনুমতি দিয়েছে তার চেয়ে বেশি হাত না তোলা।

স্ত্রীর প্রতি স্বামীর অবহেলা মানে হলো স্ত্রীর হক আদায় না করা, তার শারীরিক, মানসিক, আবেগিক ও ধর্মীয় প্রয়োজনকে উপেক্ষা করা। ইসলামে এটাকে গুনাহ ধরা হয় কারণ নিকাহের মাধ্যমে স্বামী-স্ত্রীর মাঝে একে অপরের উপর নির্দিষ্ট হক সৃষ্টি হয়।

১. *অবহেলা কয়েকভাবে হয়*

ক. আর্থিক অবহেলা
- স্ত্রীর নফকা না দেওয়া। খাবার, পোশাক, বাসস্থান, চিকিৎসার খরচ না দেওয়া।
- নিজে খেয়ে-দেয়ে স্ত্রীকে অবহেলায় রাখা। অথচ রাসূল ﷺ বলেছেন: _"তুমি যা খাও তাকে তা খাওয়াও, তুমি যা পরো তাকে তা পরাও"_ [আবু দাউদ: ২১৪২]।
- স্ত্রীর উপার্জনে চোখ দেওয়া, অথচ নিজের দায়িত্ব পালন না করা।

খ. মানসিক ও আবেগিক অবহেলা
- স্ত্রীর সাথে কথা না বলা, তার কথা শুনতে না চাওয়া।
- তার কষ্ট, দুঃখ, টেনশনকে তুচ্ছ মনে করা। "এতো কিছু নিয়ে আবার চিন্তা কিসের" বলে উড়িয়ে দেওয়া।
- প্রশংসা না করা, ভালোবাসা প্রকাশ না করা। অথচ রাসূল ﷺ আয়েশা রা. এর সাথে মজা করতেন, তাকে আদর করে ডাকতেন।
- অন্য নারীর সাথে তুলনা করা, ছোট করা, অপমান করা।

গ. শারীরিক অবহেলা
- দীর্ঘ সময় স্ত্রীর থেকে দূরে থাকা, তার শারীরিক চাহিদাকে গুরুত্ব না দেওয়া।
- মারধর করা, কষ্ট দেওয়া। ইসলাম শুধু হালকা শাসনের অনুমতি দিয়েছে, সেটাও শেষ উপায় হিসেবে।
- সম্পর্ককে শুধু দৈহিক চাহিদা পূরণের মাধ্যম মনে করা, ভালোবাসা-মায়া না থাকা।

ঘ. ধর্মীয় ও সময়গত অবহেলা

- স্ত্রীকে দ্বীন শেখানো না, নামাজ-পর্দায় উৎসাহ না দেওয়া।
- সারাদিন বাইরে, বন্ধুদের সাথে, মোবাইলে সময় কাটানো, কিন্তু স্ত্রীর জন্য ১০ মিনিট সময় না থাকা।
- সন্তান লালন-পালনের দায়িত্ব পুরোটা স্ত্রীর উপর ছেড়ে দেওয়া।

২. *কেন এটা সমস্যা*

দাম্পত্য জীবনে প্রভাব:

- স্ত্রীর মনে একাকীত্ব, হীনমন্যতা, ডিপ্রেশন আসে।
- ভালোবাসা কমে যায়, সম্পর্ক শুধু দায়িত্বে পরিণত হয়।
- স্ত্রী মানসিকভাবে ভেঙে পড়লে সন্তানও ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ:

আল্লাহ বলেন: _"তোমরা তাদের সাথে সদ্ভাবে বসবাস করো"_ [সূরা নিসা: ১৯]।
রাসূল ﷺ বলেন: _"তোমাদের মধ্যে সেই উত্তম, যে তার স্ত্রীর কাছে উত্তম। আর আমি আমার স্ত্রীদের কাছে উত্তম"_ [তিরমিযি: ৩৮৯৫]।
স্ত্রীর হক নষ্ট করলে কিয়ামতে জবাবদিহি করতে হবে।

৩. *অবহেলা কেন হয়*

১. *ভুল ধারণা*: "পুরুষের কাজ বাইরে, ঘরের কাজ নারীর" — এটাকে চরমভাবে মেনে নিয়ে ঘরের সব দায়িত্ব ঝেড়ে ফেলা।
২. *অহংকার*: স্ত্রীকে নিজের চেয়ে ছোট ভাবা, তার মতামতের দাম না দেওয়া।
৩. *অন্য নেশা*: কাজের চাপ, বন্ধু, মোবাইল, গেম — স্ত্রীকে সময় দেওয়া বোরিং লাগা।
৪. *আগের অভ্যাস*: বাবা-মাকে দেখেছে মায়ের সাথে খারাপ আচরণ করতে, সেটাই শিখেছে।

৪. *সমাধান কী*

স্বামীর জন্য:
1. *নিয়ত ঠিক করো*: স্ত্রীকে আল্লাহর আমানত ভাবো। তার সাথে ভালো ব্যবহার ইবাদত।
2. *সময় দাও*: দিনে ১৫-২০ মিনিট শুধু তার জন্য। কথা বলো, তার দিন কেমন গেল শোনো।
3. *প্রশংসা করো*: রান্না, সাজ, ত্যাগ — ছোট হলেও বলো "ভালো হয়েছে"।
4. *সাহায্য করো*: ঘরের কাজে হাত লাগাও। রাসূল ﷺ নিজেও ঘরের কাজ করতেন।
5. *ক্ষমা চাও*: ভুল হলে স্বীকার করো। এতে ছোট হওয়া যায় না, বরং মর্যাদা বাড়ে।

স্ত্রীর জন্য:
1. শান্তভাবে বোঝাও: অভিযোগের সুরে না বলে বলো "আমার এটা ফিল হয়, তুমি একটু সময় দিলে ভালো লাগত"।
2. দোয়া করো: হিদায়াতের মালিক আল্লাহ।
3. নিজেকে অবহেলিত ভেবে গুনাহে জড়িয়ো না।

৫. *যখন সীমা ছাড়িয়ে যায়*

যদি শারীরিক নির্যাতন হয়, নফকা না দেয়, অপমান করে, আর সংশোধন না হয় — তখন ইসলাম সালিশ, আলাদা থাকা, এমনকি তালাকেরও অনুমতি দিয়েছে। নিজেকে নষ্ট হতে দিতে বলা হয়নি।

মূল কথা: বিয়ে মানে শুধু ছাদ আর খাবার দেওয়া না। স্ত্রী চায় সম্মান, সময়, ভালোবাসা, নিরাপত্তা। এগুলো না দিলে সেটা অবহেলা, আর এটা আল্লাহর কাছেও পছন্দনীয় না।

বউ-শাশুড়ি প্রতিযোগিতা

মানে একই বাড়িতে দুই নারীর মাঝে আধিপত্য, সম্মান, ভালোবাসা আর নিয়ন্ত্রণ নিয়ে টানাপোড়েন। এটা শুধু বাংলাদেশ-ভারত না, পৃথিবীর প্রায় সব সমাজেই কম-বেশি দেখা যায়। এটাকে "competition" বলা হয় কারণ দুজনই একই পুরুষের মন, সময়, আর সিদ্ধান্তে প্রভাব রাখতে চায়।
মা ছেলেকে প্রান দিয়ে ভালোবাসেমা যখন দেখে ভালোবাসার অর্ধেক ওয়াইফই নিয়ে গেছে, আবার ওয়াইফ যখন দেখে তার ভালোবাসার অর্ধেক মায়ের কাছে, এই বিষয়টা ছেকেই মূলত সম্পর্কের সূচনা হয়। মূলত এটি ভালোবাসার কম্পিটিশন। অন্য কোনো বিষয় নয়। আর এই দুটি সম্পর্কেই কোনো যুক্তি-তর্ক চলে না। বরং দুটি সম্পর্কেই ভালোবাসা।

১. *কেন হয় এই প্রতিযোগিতা?*

ক. মায়ের দিক থেকে কারণ
1. *ছেলেকে হারানোর ভয়*: ২০-৩০ বছর যাকে নিজে মানুষ করলো, বউ আসার পর সে "পর" হয়ে যাচ্ছে মনে হয়।
2. *আধিপত্য ধরে রাখা*: আগে বাড়ির সব সিদ্ধান্ত সে নিতো। এখন বউ হস্তক্ষেপ করলে মনে হয় সম্মান কমে গেল।
3. *নিজের শাশুড়ির কাছে পাওয়া আচরণ*: তিনি যেমন কষ্ট পেয়েছেন, তিনিও সেটাই রিপিট করেন। "আমি সহ্য করেছি, তুমিও করো"।
4. *নিরাপত্তাহীনতা*: বয়স হলে ছেলে-বউ তাকে দেখবে কিনা, সেই ভয়।

খ. বউয়ের দিক থেকে কারণ
1. *নিজের সংসার নিজের মতো চালানোর ইচ্ছা*: নতুন বউ চায় স্বাধীনতা, নিজের নিয়মে চলতে।
2. *অতিরিক্ত হস্তক্ষেপ সহ্য না হওয়া*: রান্না, সন্তান লালন, পোশাক—সব জায়গায় মন্তব্য বিরক্তিকর লাগে।
3. *স্বামীর কাছ থেকে অগ্রাধিকার চাওয়া*: "আমি না মা?"—এই তুলনায় যাওয়া।

4. *সামাজিক চাপ*: বান্ধবী, বোনদের কাছে শুনে "শাশুড়ি মানেই খারাপ"—এই মনোভাব তৈরি হয়।

গ. ছেলের/স্বামীর ভূমিকা
সবচেয়ে বড় সমস্যা হয় যখন ছেলে দুজনের মাঝে ব্যালেন্স করতে পারে না।
- মায়ের পক্ষ নিলে বউ বলে "তুমি মা পাগল"।
- বউয়ের পক্ষ নিলে মা বলে "বউ পেয়ে মাকে ভুলে গেলি"।

২. *এই প্রতিযোগিতার ফলাফল*

1. *মানসিক অশান্তি*: বাড়িতে সবসময় থমথমে পরিবেশ। ছোট বাচ্চারা ভয় পায়, ডিপ্রেশনে যায়।
2. *স্বামীর উপর চাপ*: দুই দিক সামলাতে গিয়ে সে মানসিকভাবে ভেঙে পড়ে।
3. *ডিভোর্স পর্যন্ত গড়ায়*: অনেক ক্ষেত্রে বউ বলে "তোমার মা থাকবে নাকি আমি?"।
4. *সম্পর্ক নষ্ট*: মা-ছেলের সম্পর্ক, স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক দুটোই বিষাক্ত হয়ে যায়।

৩. *ইসলাম কী বলে?*

ইসলামে মা-বাবার মর্যাদা সবচেয়ে উপরে। _"মায়ের পায়ের নিচে সন্তানের জান্নাত"_।
আবার স্ত্রীরও হক আছে—তাকে আলাদা ঘর, খোরপোষ, সম্মান দিতে হবে।

রাসূল ﷺ নিজে শাশুড়ি-বউয়ের মাঝে ইনসাফ করতেন। কাউকে ছোট করতেন না। মানে দুজনের হক আলাদা। মাকে মায়ের মতো, বউকে স্ত্রীর মতো। একটাকে আরেকটার জায়গায় বসানো যাবে না।

৪. *সমাধানের উপায়*

স্বামীর জন্য:

1. *সীমারেখা টানো*: মাকে বোঝাও "মা, তুমি আমার জান্নাত। কিন্তু সংসারটা ও চালাবে।"

বউকে বোঝাও "ও আমার মা, উনাকে সম্মান দিতেই হবে।"

2. *তুলনা করো না*: কখনো বলো না "মা এমন করতো, তুমি কেন করো না?" বা "বউ এমন বলে, তুমি কেন বোঝো না?"

3. *দুজনকে আলাদা সময় দাও*: মায়ের সাথে একা বসো, বউয়ের সাথেও একা বসো। দুজনকে একসাথে বসিয়ে বিচার করতে যেও না।

4. *মিডিয়েটর হও, বিচারক না*: দুজন ঝগড়া করলে দুজনকেই শান্ত করো, দোষ খুঁজো না।

শাশুড়ির জন্য:

1. মেনে নাও যে ছেলে এখন বড় হয়েছে, তার নিজের সংসার আছে।

2. পরামর্শ দাও, আদেশ না। বউ চাইলে শুনবে, না চাইলে জোর করো না।

3. নিজের সময় নিজের মতো কাটাও—নামাজ, কুরআন, বান্ধবী, কাজ। শুধু ছেলের সংসারে নাক গলালে দূরত্ব বাড়ে।

বউয়ের জন্য:

1. শাশুড়িকে "দ্বিতীয় মা" ভাবতে পারলে ভালো, না পারলেও "বয়স্ক মানুষ" হিসেবে সম্মান দাও।

2. প্রতিটা কথা ধরে বসে থেকো না। ৮০% কথা কানে না নিলে জীবন সহজ হয়।

3. স্বামীর কাছে নালিশ না করে সরাসরি শান্তভাবে কথা বলো।

৫. *মনে রাখার মতো কথা*

বাড়ি শান্তি রাখতে হলে ৩টা জিনিস লাগে:

1. *শাশুড়ি*: ছেলেকে ছেড়ে দিতে শিখুক।

2. *বউ*: শাশুড়িকে মেনে নিতে শিখুক।

3. *ছেলে*: দুজনের মাঝে সেতু হোক, দেয়াল না।

একটা সত্যি কথা হলো—শাশুড়িও একদিন বউ ছিল, বউও একদিন শাশুড়ি হবে। আজ যেমন আচরণ করবে, কাল তেমনই ফেরত পাবে।

##

বউ-শাশুড়ির সম্পর্ক ভালো রাখার ১০টা প্র্যাকটিক্যাল টিপস

সমস্যা বউ বা শাশুড়ি না, সমস্যা হলো "তুলনা" আর "নিরাপত্তাহীনতা"

মা ভয় পায় ছেলেকে হারাবে, বউ ভয় পায় অবহেলিত হবে। এই ভয়টাই ঝগড়ার রূপ নেয়।

ছেলেই মূল চাবি

সে যদি দুজনকে আলাদা জায়গায় সম্মান দেয়, দুজনকেই আশ্বস্ত করে, তাহলে ৭০% সমস্যা এমনিতেই মিটে যায়। সে যদি পক্ষ নেয়, আগুনে ঘি ঢালে।

১. *সম্মান আগে, ভালোবাসা পরে*
শুরুতে ভালোবাসা না আসলেও সম্মান দিয়ে কথা বলো। "আপনি" করে বলা, উঁচু গলায় না বলা—এই ছোট জিনিসই বরফ গলায়।

২. *তুলনা বন্ধ*
কখনো বলো না "আমার মা এমন করতো" বা "আমার মেয়ে বউ এমন না"। তুলনা শুনলেই মন বিষিয়ে যায়।

৩. *সীমারেখা পরিষ্কার রাখো*
বউয়ের রান্না-ঘর, সন্তান লালন—এটা তার জায়গা। শাশুড়ি পরামর্শ দেবে, আদেশ না।

বউও বুঝবে এটা তার শ্বশুরবাড়ি, হোটেল না।

৪. *ছোট ছোট উপহার আর খেয়াল*
ঈদে শাশুড়ির জন্য শাড়ি, বউয়ের জন্য চকলেট—দাম বড় না, মনে রাখাটাই বড়।
অসুস্থ হলে এক গ্লাস পানি এগিয়ে দেওয়াও অনেক কিছু।

৫. *স্বামীর ভূমিকা ব্যালেন্সার*
স্বামী দুজনের সামনে কাউকে ছোট করবে না। আলাদা করে দুজনকে বোঝাবে।
"মা, ও নতুন, একটু সময় দাও" আর "ও তোমার মা, রাগ করো না"—এই এক লাইনে অনেক ঝামেলা মেটে।

৬. *কানে কম নাও, মুখে কম বলো*
শাশুড়ির ১০টা খোঁচার মধ্যে ৮টা ইগনোর করো। বউয়ের ১০টা ভুলের মধ্যে ৮টা ক্ষমা করো।
যা বলবেই, সেটা একা ডেকে নরম গলায় বলো।

৭. *একসাথে খাও, একসাথে বসো*
দিনে একবেলা একসাথে খাওয়া, চা খাওয়া। খাওয়ার টেবিলে ঝগড়া হয় না।
১০ মিনিট গল্প করলেই "আমরা পর" ভাবটা কমে।

৮. *নিজের জায়গা নিজে তৈরি করো*
বউ নিজের একটা ছোট জগৎ রাখুক—বই পড়া, টিউশনি, হবি।
শাশুড়িও নামাজ, কুরআন, বান্ধবী নিয়ে ব্যস্ত থাকুক। ২৪ ঘণ্টা একে অন্যের পেছনে লাগলে ঝগড়া হবেই।

৯. *ভুল হলে সরি বলতে শেখো*
শাশুড়ি বয়স্ক বলে সবসময় ঠিক হবে না। বউ নতুন বলে সব ভুল করবে না।
"আচ্ছা মা, আমার ভুল হয়েছে" একটা কথা সম্পর্ক বাঁচিয়ে দেয়।

১০. *মনে রাখো: এটা রেস না*
কে জিতলো, কে হারলো—এই মনোভাব থাকলে বাড়ি নরক হয়।
দুজনই যদি ভাবে "আমি এই বাড়িটা শান্ত রাখবো", তাহলে আপনাআপনি শান্তি চলে আসে।

সবচেয়ে বড় কথা: শাশুড়ি ৩০ বছর কষ্ট করে যে ছেলেকে বড় করলো, সেই ছেলেই তোমার স্বামী। আর বউ না থাকলে সেই ছেলের বৃদ্ধ বয়সের সঙ্গী কেউ থাকতো না।

দুজনই আসলে একই মানুষের ভালো চায়, শুধু প্রকাশের ধরন আলাদা।

#শ্বশুরালয়কে আপন মনে করতে না পারা:

শ্বশুরালয়কে আপন মনে না করতে পারা — এটা নতুন বউদের খুব কমন একটা অনুভূতি। জোর করে "আপন" ভাবা যায় না, এটা আসে সময়, আচরণ আর মনের শান্তি থেকে।

কেন এমন হয়?

1. *হঠাৎ করে নতুন পরিবেশ* - ২০-২৫ বছর যেখানে বড় হয়েছো, সেটা ছেড়ে একদিনে সম্পূর্ণ অচেনা মানুষ, নিয়ম, রান্না, ভাষার মাঝে চলে আসা। মন স্বাভাবিকভাবেই দূরে থাকে।
2. *অতিথি-হোস্ট ফিলিং* - শুরুতেই যদি মনে হয় তুমি "মেহমান" বা "বাইরের মানুষ", তাহলে আপন মনে হয় না। ছোট-খাটো কথা, খোঁচা, তুলনা এই ফিলিং আরও বাড়ায়।
3. *নিজের স্পেস না থাকা* - নিজের মতো চলার, কথা বলার, সিদ্ধান্ত নেওয়ার স্বাধীনতা না পেলে ঘরটা ঘর মনে হয় না, হোস্টেল মনে হয়।

4. *স্বামীর সাপোর্টের অভাব* - স্বামী যদি মাঝখানে ব্যালেন্স না করে, দুই দিকে চুপ থাকে, তাহলে বউ একা হয়ে যায়। একা মানুষ কোনো জায়গাকে আপন করতে পারে না।
5. *তুলনা করা* - "আমার মা এমন করতো, আমার বাড়িতে এমন হতো" — এই তুলনা মনকে পিছনে টেনে রাখে।

কী করলে আস্তে আস্তে আপন মনে হবে?

তোমার নিজের দিক থেকে:
1. *ছোট ছোট দায়িত্ব নাও* - সবার জন্য চা বানানো, অসুস্থ হলে জিজ্ঞেস করা, উৎসবে একটু হাত লাগানো। কাজ করলে মায়া তৈরি হয়।
2. *দোষ-গুণ দুটোই দেখো* - বাপের বাড়িতেও সব পারফেক্ট ছিল না। শ্বশুরবাড়ির ভালো দিকগুলো ধরো। ১০টা খারাপের মাঝে ১টা ভালো কাজও যদি মনে রাখো, মন নরম হয়।
3. *সময় দাও* - আপন হওয়া ১ মাসে হয় না। ১-২ বছর লাগে। নিজেকে সময় দাও, তাড়াহুড়া কোরো না।
4. *নিজের পরিচয় ধরে রাখো* - শ্বশুরবাড়ির বউ হওয়ার সাথে তুমি তুমিই থাকো। নিজের শখ, বন্ধু, কাজ ধরে রাখলে আত্মবিশ্বাস থাকে, তখন আপন করাটা সহজ হয়।

শ্বশুরবাড়ির মানুষের দিক থেকে যা দরকার:
1. *সমান সম্মান* - "বউ" বলে আলাদা করে ঢ়দেখলে আপন লাগে না। মেয়ের মতো আচরণ পেলে মন গলে।
2. *স্পেস দেওয়া* - সব কিছুতে নাক না গলানো। ভুল করলে শিখিয়ে দেওয়া, অপমান না করা।
3. *ছোট ছোট আপন করার চেষ্টা* - বউয়ের পছন্দের খাবার রাঁধা, তার মতামত জিজ্ঞেস করা, বাইরে গেলে মনে করে কিছু আনা।

স্বামীর ভূমিকা সবচেয়ে বড়:

সে যদি বউকে বলে "এটা তোমারও বাড়ি, নির্ভয়ে থাকো" আর মা-বাবাকে বলে "ও নতুন, একটু সময় দাও", তাহলে ৬ মাসেই অনেকটা বদলায়।

মনে রাখার কথা

শ্বশুরালয় তোমার বাপের বাড়ির মতো কখনোই ১০০% হবে না। হওয়ার দরকারও নেই।
তুমি যদি চেষ্টা করো এটাকে *"দ্বিতীয় বাড়ি"* ভাবতে, যেখানে তোমারও কিছু বলার অধিকার আছে, কিছু দায়িত্ব আছে, তাহলেই আস্তে আস্তে আপন লাগবে।

জোর করে ভালোবাসা হয় না, কিন্তু সম্মান দিলে, ছোট ছোট যত্ন নিলে ভালোবাসা জন্ম নেয়।

অধ্যায় :৪-পারিবারিক অবক্ষয়ের প্রতিকার।

১,পরিবারকে ভালোবাসায় বেঁধে রাখা:

পরিবারকে ভালোবাসায় বেঁধে রাখা মানে রক্তের সম্পর্ক থাকলেই আপন থাকবে এমন না। সম্পর্ক টিকিয়ে রাখতে হয় প্রতিদিনের ছোট ছোট কাজ, যত্ন , ভালোবাসা,দিয়ে। রক্তের বাঁধন আলগা হয়ে যায় যদি যত্ন না নাও।

১. *ভালোবাসা প্রকাশ করো, মনে পুষে রেখো না*

বাঙালি পরিবারে বড় সমস্যা হলো আমরা ভাবি "ও তো জানে আমি ভালোবাসি"। জানে না। বলতে হয়।
সবচেয়ে সুন্দর একটা কথা"আমি তোমাকে ভীষণ ভালোবাসি"/"আমি সর্বদা তোমার ভালো চাই" ।

কী করবে:
1. দিনে একবার মা-বাবাকে বলো "তোমাদের জন্য ভালো লাগে" " তোমরা বিহীন বাড়িতে থাকতে ভালো লাগে না।
2. ভাই-বোনের ভালো কাজ দেখলে প্রশংসা করো। "তুই এটা ভালো করেছিস" — ১০ সেকেন্ডের কথা, সারা দিনের মোটিভেশন।
3. ঝগড়ার পর ২৪ ঘণ্টার বেশি রাগ ধরে রেখো না। আগে যে সরি বলবে, সেই জেতে।

ভালোবাসা চুপ করে রাখলে সেটা মরে যায়। বললে বাড়ে।

২. *একসাথে খাওয়া আর কথা বলার সময় বানাও*

আজকের দিনে পরিবার ভাঙার সবচেয়ে বড় কারণ হলো সবাই এক ছাদের নিচে থেকেও আলাদা।

কী করবে:
1. দিনে অন্তত একবেলা সবাই একসাথে খাও। টিভি, ফোন বন্ধ। ২০ মিনিট শুধু কথা।
2. সপ্তাহে ১ দিন "ফ্যামিলি টাইম" রাখো — গল্প, খেলা, বাইরে ঘোরা। নিয়ম করে করলে সেটা অভ্যাস হয়।
3. ছোটদের কথা শোনো। বাচ্চা যা বলে সেটা গুরুত্ব দিলে ওরা বড় হয়েও মন খুলে কথা বলে।

একসাথে খাওয়া পরিবার একসাথে থাকে। এটা সায়েন্টিফিক ফ্যাক্ট।

৩. *ন্যায়বিচার করো, পক্ষ নিয়ো না*

পরিবারে সবচেয়ে বেশি দূরত্ব তৈরি হয় যখন একজন মনে করে "আমাকে কম ভালোবাসা হয়"।

কী করবে:
1. বাবা-মা যদি দুই সন্তানের সাথে দুই রকম ব্যবহার করো, সেটা বন্ধ করো। বড়-ছোট, ছেলে-মেয়ে ভেদাভেদ মন বিষিয়ে দেয়।
2. ভুল হলে ছোট-বড় সবাইকে সমানভাবে বলো। "ও ছোট" বলে ছেড়ে দিলে বড়জন মনে করে অবিচার হলো।
3. শ্বশুরবাড়ি-বাপের বাড়ি ব্যালেন্স করো। একদিকে ঝুঁকলে অন্যদিকে ফাটল ধরে।

ন্যায়বিচার মানে সবাইকে সমান দেওয়া না, সবার প্রয়োজন বুঝে দেওয়া।

৪. *সীমারেখা টানো, কিন্তু সম্মান রেখো*

"ভালোবাসা" মানে সবকিছুতে হস্তক্ষেপ করা না। স্পেস না পেলে মানুষ দম বন্ধ হয়ে যায়।

কী করবে:
1. বড় হয়ে গেলে সন্তানের সিদ্ধান্তে শুধু পরামর্শ দাও, চাপিয়ো না।
2. বউ-জামাইয়ের সংসারে নাক না গলাও। পরামর্শ চাইলে দাও, না চাইলে চুপ থাকো।
3. নিজের ব্যক্তিগত জায়গা রাখো। ২৪ ঘণ্টা পরিবারের জন্য বাঁচলে তুমি নিজেই ফাঁকা হয়ে যাবে।

ভালোবাসার বাঁধন ঢিলা হয় না, শুধু টাইট করে বাঁধলে ছিঁড়ে যায়।

৫. *ছোট ছোট উৎসব আর স্মৃতি তৈরি করো*

বড় ঘটনা জীবনে কম আসে। সম্পর্ক টিকে থাকে ছোট ছোট মুহূর্ত দিয়ে।
হাসি-কান্নার গল্প করো।
3. পরিবারের ভেতরে ভেতরে নিজস্ব "ভেতরের জোক" বানাও। এগুলো বাইরের কেউ বোঝে না, আর এটাই আপন করে।

স্মৃতি হলো গ্লু। যখন ঝগড়া হবে, এই স্মৃতিগুলোই টেনে ধরে রাখবে।

৬. *ক্ষমা করো, জমিয়ে রেখো না*

কোনো পরিবার পারফেক্ট না। সবাই ভুল করে। কেউ যদি ১০ বছর আগের কথা মনে করে বসে থাকে, পরিবার টিকবে না। ছাড় দিতে শিখতে হবে।

কী করবে:
1. ভুল স্বীকার করো। "আমার ভুল হয়েছিল" বলতে শেখো। এতে ছোট হওয়া যায় না, বড় হওয়া যায়।
2. ক্ষমা চাইলে মেনে নাও। প্রতিশোধ নিতে গেলে সম্পর্ক শেষ।
3. "ভুলে যাও" কঠিন হলে "মনে রেখো, কিন্তু শাস্তি দিয়ো না"।

ক্ষমা না করলে তুমি নিজেই বন্দি হয়ে যাও।

যে পরিবারে নামাজ, দোয়া, একসাথে খাওয়ার আগে বিসমিল্লাহ আছে, সেখানে অশান্তি কম থাকে।

কী করবে:
1. সপ্তাহে ১ দিন সবাই মিলে কুরআন পড়ো। ১০ মিনিট হলেও।
2. বিপদে আল্লাহর কাছে দোয়া করো, শুধু মানুষের কাছে না।
3. শেখাও যে রিজিক, শান্তি সব আল্লাহর হাতে। তাহলে মানুষের উপর প্রত্যাশা কমবে, হতাশা কমবে।

ধর্মীয় বন্ধন সবচেয়ে শক্তিশালী বন্ধন। এটা স্বার্থের উপরে।

মনে রাখার ৩টা সত্যি কথা

1. *পরিবার বাগানের মতো* — পানি না দিলে মরে যায়। রোজ ১০ মিনিট সময় দাও।
2. *ভালোবাসা কাজ দিয়ে প্রমাণ হয়, কথায় না* — "ভালোবাসি" বলার চেয়ে ১ গ্লাস পানি এগিয়ে দেওয়া বেশি কাজের। অসুস্থতায় সেবা করা ।
3. *আজ যেমন আচরণ করবে, কাল তেমন ফেরত পাবে* — তুমি বাবা-মাকে যেমন রাখবে, তোমার সন্তান তোমাকে তেমন রাখবে।

পরিবারকে ধরে রাখতে হলে সবাইকে পারফেক্ট হতে হবে না। শুধু ২-৩ জন যদি চেষ্টা করে, পুরো বাড়ির আবহাওয়া বদলে যায়। সাধারণত সেই ২-৩ জনের একজন তুমি হতে পারো।

২,বিনয় সমঝোতার প্রথম সোপান

"বিনয় সমঝোতার প্রথম ধাপ" — মানে কোনো ঝগড়া, মনোমালিন্য মেটানোর জন্য প্রথমে যেটা লাগে সেটা হলো নিজের অহংকারটাকে একটু নিচে নামানো।

যতক্ষণ "আমি ঠিক, তুমি ভুল" এই মনোভাব থাকে, ততক্ষণ সমঝোতা হয় না। বিনয় মানে হেরে যাওয়া না, এটা হলো সম্পর্কটাকে জেতানোর জন্য নিজেকে একটু ছোট করা।

মানুষ যখন বিনয়ী হয়, তখন অন্যের ওপর তার কোনো অধিকার আছে বলে সে মনে করে না। সে ভাবে, আমি আল্লাহর বান্দামাত্র, আমার কোনো মর্যাদা ও ইজ্জত নেই। আল্লাহ তাআলা আমাকে যে অবস্থায় রাখবেন তার ওপরই আমি রাজি। অন্তরে যখন এমন অনুভূতি জাগ্রত হবে, তখন অন্য কারও থেকে কিছু পাওয়ার আশা করবে না; আর আশা-আকাঙ্ক্ষা না থাকলে কোনো অভিযোগও থাকবে না। অভিযোগ না থাকলে ঝগড়া সৃষ্টি হবে না। সুতরাং বোঝা গেল, ঐক্য ও সমঝোতার প্রথম সোপান হলো বিনয়।

১. *বিনয় মানে কী এখানে?*

বিনয় মানে নিজেকে ছোট করা না। মানে হলো:

1. *নিজের ভুল স্বীকার করার সাহস* — "হ্যাঁ, আমি ওভাবে বলা উচিত হয়নি"।
2. *অন্যের কথা শোনার ধৈর্য* — মাঝখানে থামিয়ে না দেওয়া, পুরোটা শোনা।
3. *অহংকারকে সরিয়ে রাখা* — "আমার বয়স বেশি", "আমি উপার্জন করি", "আমি মা" — এই ট্যাগগুলো সরিয়ে শুধু মানুষ হিসেবে কথা বলা।

বিনয় ছাড়া সমঝোতা হয় না, শুধু যুদ্ধবিরতি হয়। ভেতরে আগুন জ্বলতেই থাকে।

২. *কেন বিনয়ই প্রথম ধাপ?*

কারণ মানুষের মন ২টা জিনিসে গলে:

1. *যখন সে বোঝে তুমি তাকে ছোট করছো না*।
2. *যখন সে দেখে তুমি সম্পর্কটাকে তর্কের চেয়ে বেশি দাম দিচ্ছো*।

তুমি যদি গলা উঁচু করে যুক্তি দাও, সামনের জনও গলা উঁচু করবে। তুমি যদি নরম হও, তার অহংকারও নরম হয়।

ইসলামে আছে: _"আল্লাহর জন্য যে বিনয়ী হয়, আল্লাহ তাকে উঁচু করেন"_। দুনিয়াতেও একই নিয়ম।

৩. *বিনয়ের মাধ্যমে সমঝোতা কীভাবে শুরু করবে?*

ধাপ ১: নিজেকে শান্ত করো
রেগে থাকা অবস্থায় কখনো সমঝোতায় যেও না। ১০ মিনিট একা বসো, পানি খাও, ওজু করো। মাথা ঠান্ডা না হলে বিনয় আসে না।

ধাপ ২: প্রথম কথা তুমি বলো
অপেক্ষা কোরো না "ও আগে সরি বলুক"। বিনয়ী মানুষ আগেই কথা বলে।
বলো: "আচ্ছা বসো, কথা বলি। আমি হয়তো ভুল বুঝেছি"।
এই একটা লাইনেই ৫০% রাগ পড়ে যায়।

ধাপ ৩: "আমি" দিয়ে কথা বলো, "তুমি" দিয়ে না
ভুল: "তুমি সবসময় আমার সাথে খারাপ ব্যবহার করো"।
ঠিক: "আমার তখন খারাপ লেগেছিল যখন ওভাবে বললে"।

"তুমি" দিয়ে শুরু করলে মানুষ ডিফেন্সিভ হয়। "আমি" দিয়ে শুরু করলে সে শোনে।

ধাপ ৪: তার দিকটা বোঝার চেষ্টা করো
জিজ্ঞেস করো: "তুমি তখন কেন ওভাবে বললে? আমার বুঝতে ভুল হলো কি?"
মানুষ চায় তার অনুভূতির দাম দেওয়া হোক। দাম পেলে সে নরম হয়।

ধাপ ৫: সমাধান চাপিয়ে দিও না
বলো: "এখন আমরা কী করলে দুজনেই শান্তি পাবো?"
সমঝোতা মানে জোর করে মানানো না, দুজন মিলে রাস্তা বের করা।

৪. *বিনয়ের উদাহরণ*

শাশুড়ি-বউয়ের ক্ষেত্রে:
বউ যদি বলে: "মা, আমি জানি আপনি আমার ভালোর জন্যই বলেন। কাল যেভাবে বলেছেন তাতে আমার কষ্ট লেগেছে। আমি চাই আমরা শান্তভাবে কথা বলি"।
এখানে বউ নিজেকে ছোট করেনি, বরং সম্পর্কটাকে বাঁচিয়েছে।

ভাই-বোনের ক্ষেত্রে:
ভাই যদি বলে: "তুই রেগে গিয়েছিলি ঠিক আছে। আমিও তোকে না বুঝে কথা শুনিয়েছি। মাফ করে দে"।
এখানে যে আগে মাথা নোয়ায়, সে-ই আসলে বড় হয়।

৫. *মনে রাখার কথা*

1. *বিনয় দুর্বলতা না, এটা শক্তি*। যে রাগ সামলাতে পারে, সে-ই আসল শক্তিশালী।
2. *সমঝোতা মানে সব মেনে নেওয়া না*। মানে হলো এমনভাবে কথা বলা যাতে দুজনের সম্মান থাকে।
3. *একবার বিনয় দেখালে পরের বার সামনের জনও দেখাবে*। মানুষ আয়নার মতো।

শেষ কথা:

অহংকার দিয়ে ১০ মিনিট জেতা যায়, কিন্তু সম্পর্ক হারিয়ে যায়।

বিনয় দিয়ে ১০ মিনিটে হারা যায়, কিন্তু সম্পর্ক বেঁচে যায়।

কষ্টসয়ে যাওয়া:

***"কষ্ট সয়ে যাওয়া"* মানে নিজেকে মেরে ফেলা না। মানে হলো — সব কষ্টের জবাব ঝগড়া, পাল্টা আঘাত বা ভেঙে পড়া দিয়ে না দেওয়া। কিছু কষ্ট আছে যেটা সয়ে গেলে সম্পর্ক বাঁচে, মন শান্ত থাকে, আর আল্লাহর কাছে সওয়াব জমা হয়।**

وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ ۗ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ ﴿١٥٥﴾
الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ﴿١٥٦﴾

অর্থ:

১৫৫. আর আমি অবশ্যই তোমাদেরকে পরীক্ষা করব কিছু ভয়, ক্ষুধা, জান-মাল ও ফল-ফসলের ক্ষতির মাধ্যমে। আর তুমি ধৈর্যশীলদের সুসংবাদ দাও।

১৫৬. যারা, যখন তাদের উপর কোনো মুসিবত আসে, তখন বলে, "নিশ্চয়ই আমরা আল্লাহর জন্য এবং নিশ্চয়ই আমরা তাঁরই দিকে ফিরে যাব।"

সূরা আল-ইনশিরাহ, আয়াত ৫-৬

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٥﴾
إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٦﴾

অর্থ:

নিশ্চয়ই কষ্টের সাথে স্বস্তি আছে।

নিশ্চয়ই কষ্টের সাথে স্বস্তি আছে।

হাদিস

- *ঈমানের পরীক্ষা:* রাসুল্লাহ (সা.) বলেছেন, "মুমিনদের অবস্থা কতই না চমৎকার! তার প্রতিটি বিষয়ই কল্যাণকর। যদি সে আনন্দ বা সুখ লাভ করে, তবে সে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করে, যা তার জন্য কল্যাণকর। আর যদি সে দুঃখ-কষ্ট বা বিপদে পতিত হয়, তবে সে ধৈর্য ধারণ করে, যা তার জন্য কল্যাণকর হয়।" (সহিহ মুসলিম)

- *গুনাহ মোচন:* রাসুল্লাহ (সা.) বলেছেন, "কোনো মুসলমানের ওপর ক্লান্তি, রোগ-শোক, দুশ্চিন্তা, কষ্ট বা কোনো বিপদ এমনকি তার গায়ে একটি কাঁটা ফুটলেও আল্লাহ তা'আলা এর বিনিময়ে তার গুনাহ মাফ করে দেন।" (সহিহ বুখারি)

- *আল্লাহর সন্তুষ্টি:* রাসুল্লাহ (সা.) আরও বলেছেন, "আল্লাহ যার মঙ্গল চান, তাকেই তিনি দুঃখ-কষ্টে বা পরীক্ষায় ফেলেন।" (সহিহ বুখারি)

কঠিন মুহূর্তে ধৈর্য ধারণ করা এবং আল্লাহর ওপর ভরসা করার মাধ্যমে একজন মুমিন তার গুনাহ মাফ করিয়ে নেয় এবং পুরস্কৃত হয়।

১. *কষ্ট সয়ে যাওয়ার মানে কী?*

কষ্ট সয়ে যাওয়া মানে ৩টা জিনিস:

1. *চুপ থাকা* — প্রতিটা কথার জবাব দিতে হবে এমন না। কিছু কথা শুনে হজম করে যাওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ।
2. *প্রতিশোধ না নেওয়া* — তোমার সাথে খারাপ করলো বলে তুমিও করবে, এটা না করা।
3. *ভেতরে জমিয়ে না রাখা* — সয়ে যাওয়া মানে মুখে হাসি, মনে আগুন না। মন থেকে মাফ করে দেওয়া।

কষ্ট সয়ে যাওয়া = দুর্বলতা না। বরং রাগ সামলাতে পারাটাই আসল শক্তি।

২. *কেন কষ্ট সয়ে যেতে হয়?*

কারণ সব কষ্টের জবাব দিলে জীবন যুদ্ধক্ষেত্র হয়ে যায়।

কারণগুলো:
1. *সম্পর্ক বাঁচাতে* — বাবা-মা, স্বামী-স্ত্রী, ভাই-বোনের সাথে প্রতিদিন তর্ক করলে সংসার টেকে না। ১০টার মধ্যে ৮টা কথা এড়িয়ে গেলে ঘর ঠান্ডা থাকে।
2. *নিজের মানসিক শান্তির জন্য* — পাল্টা জবাব দিলে ২ মিনিট শান্তি লাগে, পরে ২ দিন মাথায় ঘোরে। চুপ থাকলে ৫ মিনিট কষ্ট লাগে, তারপর শেষ।
3. *আল্লাহর কাছে মর্যাদা বাড়ে* — হাদিসে আছে: _"যে ব্যক্তি ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও রাগ দমন করে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাকে সবার সামনে ডেকে সম্মানিত করবেন"_।
4. *সামনের জন নিজেই বুঝতে পারে* — তুমি চুপ থাকলে, সে একা একা ভাববে "আমি বেশি বলে ফেললাম"।

৩. *কী ধরনের কষ্ট সয়ে যেতে হয়?*

সব কষ্ট সইতে হবে না। পার্থক্যটা বোঝো:

সয়ে যাওয়ার মতো কষ্ট:
1. ছোট খোঁচা, খোঁটা, ব্যঙ্গ।
2. ভুল বোঝাবুঝি থেকে হওয়া কথা।
3. ক্লান্তি, রাগের মাথায় বলা কথা।
4. এমন মানুষের কথা যার সাথে প্রতিদিন থাকতে হয়।

সয়ে যাওয়া উচিত না:
1. অন্যায়, জুলুম, শারীরিক-মানসিক নির্যাতন।
2. সম্মানহানি, মিথ্যা অপবাদ।
3. নিজের বা সন্তানের ক্ষতি হয় এমন কিছু।

এগুলোর জন্য কথা বলতে হবে, প্রয়োজনে দূরত্ব রাখতে হবে। সয়ে গেলে জুলুম বাড়ে।

৪. *কষ্ট সয়ে যাওয়ার ৪টা প্র্যাকটিক্যাল উপায়*

১. *১০ সেকেন্ড রুল*
কেউ কিছু বললে সাথে জবাব দিও না। ১০ সেকেন্ড চুপ থাকো, পানি খাও, নিঃশ্বাস নাও। এই ১০ সেকেন্ডে রাগ ৫০% কমে যায়।

২. *নিজেকে প্রশ্ন করো: "৫ বছর পর এটা মনে থাকবে?"*
বেশিরভাগ ঝগড়া ৫ দিন পরেও মনে থাকে না। তাহলে আজ এত এনার্জি নষ্ট কেন করবে?

৩. *দু'আ করো*
মনে মনে বলো: "আল্লাহ, আপনি জানেন আমি কষ্ট পাচ্ছি। আমাকে ধৈর্য দিন। আমি এর প্রতিদান আপনার কাছ থেকে চাই"।
এটা বললে মনে হয় কষ্টটা বৃথা যাচ্ছে না।

৪. *নিজের জন্য আউটলেট রাখো*
সব কষ্ট চেপে রাখলে মানুষ অসুস্থ হয়। নামাজে কাঁদো, ডায়েরিতে লেখো, বিশ্বস্ত কাউকে বলো। সয়ে যাওয়া মানে একা সব বইতে হবে না।

৫. *কষ্ট সয়ে যাওয়ার ফল*

1. *লোকে তোমাকে সম্মান করে* — যে রাগ সামলায়, তাকে সবাই ভয় পায় না, মান্য করে।
2. *মাথা ঠান্ডা থাকে* — সিদ্ধান্ত ভুল হয় না।
3. *আল্লাহ সাহায্য করেন* — ধৈর্যশীলদের সাথে আল্লাহ আছেন।
4. *সম্পর্ক টেকে* — একটা পরিবার ভাঙে ১ দিনে, জোড়া লাগে ১০ বছরেও না।

মনে রাখার কথা

কষ্ট সয়ে যাওয়া মানে নিজেকে শেষ করে দেওয়া না। মানে হলো —
_"আমি জবাব দিতে পারি, কিন্তু আমি সম্পর্কটাকে জবাবের চেয়ে বড় মনে করি"_।

যেখানে তোমার চুপ থাকায় ১টা সংসার বাঁচে, সেখানে চুপ থাকাটাই সবচেয়ে বড় কথা বলা।

রাগ দমন:

***রাগ দমন* মানে রাগ অনুভব না করা না। মানে হলো রাগ আসার পর সেটাকে তোমার কন্ট্রোলে রাখা, যেন রাগ তোমাকে কন্ট্রোল না করে।**
রেগে গেলেন তো হেরে গেলেন:*

রাগ সবচেয়ে বড় শত্রু। রাগ নিয়ন্ত্রণ করা সবচেয়ে বড় বীরত্ব। আর সবচেয়ে উত্তম সমাধান হচ্ছে যখন ওয়াইফ রেগে যাবে হাজবেন্ডকে চুপ হবে। যখন তার রাগ শেষ হয়ে যাবে, তখন হাজবেন্ড চাইলে তার রাগ নি পারবেন। কিন্তু কখনোই একসাথে দুজন রেগে যাওয়া উচিত নয়। এর রকমের দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। ওলামায়ে কেরামের কাছে মাসআলা জি জন্য অধিকাংশ লোকই আসে, “হুজুর, রাগের মাথায় তালাক দিয়ে দি করা যায়?” আরে তালাক তো রাগের মাথায়ই দেওয়া হয়। ঠান্ডা মাথা একটা পবিত্র সম্পর্ককে টুকরো টুকরো করে ভেঙে ফেলা যায় না।

১. *রাগ আসলে আসলে কী হয়?*

রাগ একটা স্বাভাবিক অনুভূতি। সমস্যা হয় যখন রাগ মুখ, হাত, কথার মাধ্যমে বের হয়ে যায়।

হাদিসে নবী (সা.) বলেন: _"প্রকৃত বীর সে নয় যে কুস্তিতে অন্যকে হারায়। বরং প্রকৃত বীর সে, যে রাগের সময় নিজেকে সংযত রাখে"_।
মানে শক্তি হলো রাগ আটকানোয়, ছাড়ায় না।

২. *রাগ দমনের ৬টা প্র্যাকটিক্যাল উপায়*

১. *শারীরিক অবস্থা বদলাও*
নবী (সা.) বলেছেন: _"যখন তোমাদের কারো রাগ আসে আর সে দাঁড়ানো থাকে, সে যেন বসে পড়ে। যদি রাগ না কমে, তবে যেন শুয়ে পড়ে"_।
কারণ রাগ আসলে শরীর গরম হয়। অবস্থা বদলালে মাথা ঠান্ডা হয়।

২. *অজু করো*
রাগ আগুনের মতো। আর আগুন পানিতে নেভে। অজু করলে শরীর আর মন দুটোই ঠান্ডা হয়।

৩. *"আউযুবিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম" বলো*
রাগ শয়তানের পক্ষ থেকে আসে। এই দু'আ বললে শয়তানের কুমন্ত্রণা কেটে যায়।

৪. *১০ সেকেন্ড চুপ থাকো*
রাগের মাথায় বলা ১টা কথা ১০ বছরের সম্পর্ক নষ্ট করে দেয়। জবাব দিতে ইচ্ছা করলেও ১০ সেকেন্ড চুপ থাকো। এই সময়ে ৭০% রাগ চলে যায়।

৫. *চিন্তা বদলাও*
নিজেকে জিজ্ঞেস করো:
- "৫ বছর পর এটা মনে থাকবে?"
- "আমি রাগ করে কী পাবো?"
- "আমি কি কিয়ামতের দিন আল্লাহর সামনে ডাক পেতে চাই?"
হাদিস: _"যে ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও রাগ দমন করে, আল্লাহ কিয়ামতের দিন তাকে সব সৃষ্টির সামনে ডেকে ইচ্ছামতো হুর বেছে নেওয়ার সুযোগ দেবেন"_।

৬. *ক্ষমা করার অভ্যাস করো*
যে মাফ করে, আল্লাহ তার মর্যাদা বাড়ান। রাগ জমিয়ে রাখলে নিজেই কষ্ট পাও। মাফ করে দিলে তুমিই হালকা হও।

৩. *কখন রাগ দমন করবে না?*

সব রাগ দমন করা ভালো না। আল্লাহর জন্য রাগ করা ইবাদত।
- কেউ আল্লাহ, রাসুল, কুরআনকে গালি দিলে
- অন্যায়, জুলুম, শিশু নির্যাতন দেখলে
এই জায়গায় চুপ থাকা গুনাহ। কিন্তু এখানেও মারামারি না, শান্তভাবে প্রতিবাদ করতে হয়।

৪. *রাগ দমন করতে পারলে কী লাভ?*

1. *সম্পর্ক টেকে* — সংসার, বন্ধুত্ব ভাঙে না।
2. *সম্মান বাড়ে* — মানুষ ভয় না, মান্য করে।
3. *সিদ্ধান্ত ভুল হয় না* — রাগে মানুষ সবচেয়ে বড় ভুল করে।
4. *আল্লাহর ভালোবাসা পাও* — কুরআনে আছে: _"আল্লাহ ধৈর্যশীলদের ভালোবাসেন"_।

৫. *একটা ছোট্ট অনুশীলন শুরু করো আজ থেকে*

আজ যদি কেউ তোমাকে খোঁচা দেয়, সাথে জবাব দিও না। মনে বলো: "আমি এটা আল্লাহর জন্য ছেড়ে দিলাম"।
দেখবে, ১ সপ্তাহ পর রাগের উপর তোমার কন্ট্রোল বেড়ে গেছে।

রাগ দমন করা মানে দুর্বল হওয়া না। মানে হলো তুমি নিজের মালিক। রাগ তোমার মালিক না।

ভালো কিছু প্রত্যাশা না করা

দুনিয়ায় চলার পথে বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন, প্রিয় লোকদের কাছেও কিছু প্রত্যাশা করবে না। যেমন : সে আমাকে এটা দেবে, ওটা দেবে, উপকার করবে, আমাকে সম্মান করবে, সাহায্য করবে। কোনো মাখলুক থেকে কিছু পাওয়ার আশা করবে না। কোনো মাখলুক থেকে যখন কিছু পাওয়ার আশা ছেড়ে দেবে, তখন যদি ভালো কিছু পেয়েও যাও তখন তুমি খুশি হবে, আনন্দিত হবে। তার জন্য আল্লাহ তাআলার শুকরিয়া আদায়ের সুযোগ হবে। বলবে, হে আল্লাহ, আপনার রহমতে আপনি তার অন্তরে ভালো কিছু ঢেলে দিয়েছেন, ফলে সে আমার সঙ্গে ভালো আচরণ করেছে।

"ভালো কিছু প্রত্যাশা না করা" — এটা শুনতে খারাপ লাগলেও, জীবনের একটা বড় শান্তির রাস্তা।

চলো ভেঙে বলি:

১. *কেন প্রত্যাশা না করাই ভালো?*

কারণ প্রত্যাশা = কষ্টের শুরু।
তুমি যখন কারো কাছে আশা করো "ও আমাকে বুঝবে, সাহায্য করবে, ভালো ব্যবহার করবে", তখন যদি ওটা না পাও, মন ভাঙে, রাগ হয়, অভিমান হয়।

মানুষ বদলায়, ভুলে যায়, স্বার্থ দেখে। তাই মানুষের কাছে ১০% আশা রাখলে ১০% ঠকবে।

২. *তাহলে কী করবে?*

আশা শুধু আল্লাহর কাছে রাখো।
মানুষকে দিয়ে কাজ করাও, কথা বলো, সম্পর্ক রাখো — কিন্তু মনে রেখো: "এরা শুধু মাধ্যম। দেওয়ার মালিক আল্লাহ।"

কুরআনে আছে:

সূরা আলে ইমরান, আয়াত ১৬০

আরবি:
إِن يَنصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ ۖ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَن ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ ۗ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ

অর্থ:
যদি আল্লাহ তোমাদের সাহায্য করেন, তবে তোমাদের উপর কেউ বিজয়ী হতে পারবে না। আর যদি তিনি তোমাদের সাহায্য না করেন, তবে তাঁর পরে এমন কে আছে যে তোমাদের সাহায্য করবে? আর মুমিনদের উচিত শুধু আল্লাহর উপরই ভরসা করা।

যখন আশা আল্লাহর কাছে থাকবে, তখন মানুষ না দিলেও তুমি ভাঙবে না। কারণ তুমি জানো, তিনি সময়মতো এর চেয়ে ভালো দেবেন।

৩. *এর মানে এই না যে কাউকে বিশ্বাস করবে না*

মানে হলো:
- ভালো ব্যবহার করবে, কিন্তু বদলে ভালো ব্যবহার ফেরত পাবে — এটা ভাববে না।
- সাহায্য করবে, কিন্তু "ও আমাকেও করবে" ভাববে না।
- করলে আলহামদুলিল্লাহ। না করলে "ঠিক আছে, আমি আল্লাহর জন্য করেছি"।

এটাকে বলে *নফসকে মুক্ত করা*।

৪. *লাভ কী হয়?*

1. *মন হালকা থাকে* — কেউ অবহেলা করলেও কষ্ট কম লাগে।

2. *মানুষকে ক্ষমা করা সহজ হয়* — কারণ তুমি জানো, ওদের কাছ থেকে কিছু পাওয়ার ছিল না।
3. *দিল শক্ত হয়* — ধাক্কা খেলেও ভেঙে পড়ো না।
4. *আল্লাহর সাথে সম্পর্ক গভীর হয়* — কারণ সব ফেরত তাঁর কাছেই চাও।

সংক্ষেপে:
*_মানুষের কাছে প্রত্যাশা কমাও, দায়িত্ব পালন বাড়াও।
আল্লাহর কাছে প্রত্যাশা বাড়াও, ভরসা রাখো।

ধৈর্য ধারণ ও অল্পে তুষ্ট থাকা

এ দুটো জিনিস একসাথে থাকলে দুনিয়া আর আখিরাত দুই জায়গাতেই তুমি জিতে যাবে।

১. *ধৈর্য ধারণ মানে কী?*

ধৈর্য মানে কষ্ট হলেও ভেঙে না পড়া। তিন জায়গায় ধৈর্য লাগে:
1. *আল্লাহর হুকুম মানতে* — নামাজ, রোজা কষ্ট হলেও করা।
2. *গুনাহ থেকে বাঁচতে* — ইচ্ছা হলেও হারাম থেকে দূরে থাকা।
3. *বিপদে ভেঙে না পড়তে* — অসুখ, লোকসান, অপমান আসলেও আল্লাহকে দোষ না দেওয়া।

কুরআন বলে: *সূরা আল-বাকারা, আয়াত ১৫৩*
আরবি:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ

অর্থ:

হে মুমিনগণ, ধৈর্য ও নামাজের মাধ্যমে সাহায্য চাও। নিশ্চয়ই আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন

সূরা আয-যুমার, আয়াত ১০

আরবি:
قُلْ يَا عِبَادِ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ ۚ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ ۗ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ ۗ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ

অর্থ:
বলো, হে আমার মুমিন বান্দারা, তোমরা তোমাদের রবকে ভয় করো। যারা এই দুনিয়ায় সৎকাজ করেছে তাদের জন্য রয়েছে কল্যাণ। আর আল্লাহর পৃথিবী প্রশস্ত। ধৈর্যশীলদের তো বিনা হিসাবে প্রতিদান দেওয়া হবে।

২. *অল্পে তুষ্ট থাকা মানে কী?*

অল্পে তুষ্ট মানে যা আছে সেটাতেই শান্তি পাওয়া। বেশি চাই না এমন না, বরং "যা পেয়েছি এটাই আল্লাহর নিয়ামত" এটা মনে করা।

নবী (সা.) বলেন:
"সে-ই সফল হয়েছে যে ইসলাম গ্রহণ করেছে, প্রয়োজন মতো রিযিক পেয়েছে, আর আল্লাহ তাকে যা দিয়েছেন তাতে তুষ্ট করেছেন" [সহিহ মুসলিম]

অল্পে তুষ্ট মানে অলস হওয়া না। চেষ্টা করবে, কিন্তু ফল আল্লাহর হাতে ছেড়ে দেবে।

৩. *এই দুটো একসাথে থাকলে কী হয়?*

ধৈর্য ধারণ অল্পে তুষ্ট থাকা ফলাফল
কষ্টে ভেঙে পড়ো না যা আছে সেটা নিয়েই খুশি মন শান্ত থাকে
লোকে কষ্ট দিলেও রাগ কম হয় অন্যের সাথে নিজেকে মেলাও না হিংসা-হতাশা কমে

রিযিক দেরিতে আসলেও হতাশ না হারাম পথে যাও না রিযিকে বরকত আসে

৪. *কীভাবে অভ্যাস করবে?*

ধৈর্য বাড়ানোর জন্য:
1. বিপদ আসলে সাথে "ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন" বলো। এটা মনকে মনে করিয়ে দেয় সব আল্লাহর কাছ থেকেই।
2. ভাবো: "এই কষ্টের বদলে আল্লাহ গুনাহ মাফ করছেন।"
3. যারা তোমার চেয়ে কষ্টে আছে তাদের দিকে তাকাও।

অল্পে তুষ্ট হওয়ার জন্য:
1. প্রতিদিন ৩টা জিনিস লেখো যেটার জন্য শুকরিয়া করো — গরম ভাত, সুস্থ শরীর, ঘুমানোর ছাদ।
2. যাদের তোমার চেয়ে কম আছে তাদের দেখো। যাদের কোটি টাকা আছে তাদের না।
3. হে আল্লাহ, তুমি আমাকে যা দিয়েছো তাতে তুষ্ট করে দাও।

৫. *একটা কথা মনে রাখো*

দুনিয়া ধৈর্য আর তুষ্টির পরীক্ষা।
যে ধৈর্য ধরে, আল্লাহ তাকে এমন দেন যেটা সে কল্পনাও করে নাই।
যে অল্পে তুষ্ট থাকে, আল্লাহ তার অল্পকেই অনেক করে দেন।

দুনিয়ায় বদলা নেওয়ার মানসিকতা না রাখা"*

এটা নিজের মনের জন্য সবচেয়ে বড় রহমত।

কেউ যদি প্রশ্ন করে, আল্লাহ তাআলা তো দুনিয়াতেই সবর করছেন, কাফির-মুশরিকদের নিরাপত্তা ও রিজিক দিচ্ছেন। তারা উন্নতি ও অগ্রগতি লাভ করছে; কিন্তু পরকালে তো তাদেরকে এমন শাস্তি প্রদান করবেন, যার থেকে বাঁচার কোনো উপায় নেই। উত্তর হলো, আল্লাহ তাআলা যখন দুনিয়াতে তাদের সঙ্গে সবরের আচরণ করছেন, তাহলে আপনারাও দুনিয়াতে একই আচরণ করুন।

যে ব্যক্তি আপনাকে কষ্ট দিচ্ছে তাকে বলে দিন, আমি তোমার থেকে বদলা নেব না। তোমার বিষয় আমি আল্লাহর হাতে সোপর্দ করছি। পরকালে আল্লাহ তাআলা ইনসাফ করবেন। ব্যক্তিগত বিষয়গুলো আল্লাহর হাতে ছেড়ে দিন। কেননা, দুনিয়াতে আপনি যে প্রতিশোধ গ্রহণ করবেন, পরকালে আল্লাহর প্রতিশোধ গ্রহণের সঙ্গে এর কোনো তুলনাই চলে না। সুতরাং প্রতিশোধ নেওয়ার আগ্রহ থাকলে এখানে না নিয়ে পরকালের জন্য তুলে রাখুন; আল্লাহর ওপর ছেড়ে দিন।

রাগ, অন্যায়, অপমান হজম হয় না। তখন মনে হয় "ও আমাকে এটা করলো, আমিও ওকে দেখে নেব"। কিন্তু এই বদলা নেওয়ার আগুন প্রথমে তোমাকেই পোড়ায়।

১. *ইসলাম কী বলে?*

ইসলাম ক্ষমা আর ছেড়ে দেওয়ার শিক্ষা দেয়, যদি সেটা তাকওয়ার জন্য হয়।

কুরআন:
"যারা ক্ষোভ সংবরণ করে এবং মানুষকে ক্ষমা করে, আল্লাহ সৎকর্মশীলদের ভালোবাসেন"

"আর যদি তোমরা প্রতিশোধ নাও, তবে ঠিক ততটাই নাও যতটা তোমাদের প্রতি জুলুম করা হয়েছে। কিন্তু যদি ধৈর্য ধরো, তবে তা ধৈর্যশীলদের জন্য উত্তম"

মানে বদলা নেওয়ার অধিকার আছে, কিন্তু ছেড়ে দেওয়াটা আল্লাহর কাছে বেশি প্রিয়।

হাদিস:
রাসুল (সা.) বলেন: _"শক্তিশালী সে নয় যে কুস্তিতে অন্যকে হারায়। বরং শক্তিশালী সে, যে রাগের সময় নিজেকে সংবরণ করে"_

২. *কেন বদলা নেওয়ার মানসিকতা ছাড়া উচিত?*

1. *মনের শান্তি নষ্ট হয়*: বদলা নেওয়ার প্ল্যান মাথায় ঘুরলে ঘুম হয় না, খাওয়া হয় না। তুমি নিজেই নিজের শত্রু হয়ে যাও।
2. *আল্লাহর কাজে হস্তক্ষেপ হয়*: জুলুমের বিচার করার মালিক আল্লাহ। তুমি বদলা নিলে মনে হয় আল্লাহকে বিশ্বাস করো না।
3. *চক্র বাড়ে*: আজ তুমি বদলা নিলে, কাল ও নেবে। এভাবে শত্রুতা শেষ হয় না।
4. *নিজের আমল নষ্ট হয়*: রাগ ধরে রাখলে, গিবত করলে, বদোয়া দিলে তোমার নিজের নেকি কমে।

৩. *তাহলে অন্যায় হলে কী করবে?*

৩টা অপশন আছে, তুমি বেছে নাও:

1. *ক্ষমা করে দাও*: যদি ক্ষমা করলে তোমার মন হালকা হয় আর আল্লাহ খুশি হন। এটা সবচেয়ে বড় মর্যাদা।
2. *ন্যায়সঙ্গত প্রতিকার নাও*: আইন, সালিস, বিচারের মাধ্যমে। রাগ থেকে না, ইনসাফের জন্য।
3. *আল্লাহর কাছে ছেড়ে দাও*: "ইয়া আল্লাহ, তুমি এর বিচার করো। আমি পারছি না"। এটা দুনিয়া আর আখিরাত দুটোই বাঁচায়।

৪. *কীভাবে এই মানসিকতা বানাবে?*

1. *ভাবো*: "আমি যদি আজ ওকে মাফ করি, কিয়ামতের দিন আল্লাহও আমাকে মাফ করবেন কিনা?"
2. *দোয়া করো*: _"আল্লাহুম্মা ইন্নি আসআলুকাল আফওয়া ওয়াল আফিয়াহ"_ — হে আল্লাহ, আমি তোমার কাছে ক্ষমা আর নিরাপত্তা চাই।
3. *দুনিয়াকে ক্ষণস্থায়ী মনে করো*: আজ যে তোমাকে কষ্ট দিলো, ৫০ বছর পর দুজনেই মাটির নিচে। এত কষ্ট ধরে রাখার দরকার কী?
4. *নিজের হিসাব নিয়ে ব্যস্ত হও*: অন্যের বদলা নিতে গেলে নিজের হিসাব ভুলে যাও।

কথা একটাই:
দুনিয়ায় বদলা নিলে সাময়িক শান্তি পাবে, কিন্তু অন্তরে আগুন থাকবে।
আল্লাহর জন্য ছেড়ে দিলে সাময়িক কষ্ট হবে, কিন্তু অন্তরে নূর আসবে।

সারমর্ম:

ইসলামি নারী শিক্ষার অভাবই পারিবারিক অবক্ষয়ের অন্যতম মূল কারণ। নারী তো পরিবারের প্রথম মাদরাসা, সন্তানের প্রথম শিক্ষিকা। যখন তিনি দ্বীনের সঠিক জ্ঞান, তাকওয়া আর আদব থেকে বঞ্চিত হন, তখন ঘরে ইবাদতের নূর ম্লান হয়ে যায়, সন্তানের চরিত্র গঠন অসম্পূর্ণ থেকে যায়, আর স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক থেকেও দ্বীনের প্রশান্তি হারিয়ে যায়। এর ফলেই পরিবারে বরকত কমে, ভুল বোঝাবুঝি বাড়ে, আর দুনিয়ামুখীতা ও অপসংস্কৃতি সহজেই জায়গা করে নেয়

এর একমাত্র প্রতিকার হলো নারীকে কুরআন-সুন্নাহর আলোয় আলোকিত করা। যখন ঘরের মা নিজে নামাজ, পর্দা, লজ্জাশীলতা, ধৈর্য আর ক্ষমার শিক্ষা অর্জন করেন এবং তা সন্তানদের মাঝে ছড়িয়ে দেন, তখন ঘর হয়ে ওঠে শান্তি ও হেদায়াতের কেন্দ্র।

একজন নারী পারে তার সন্তানকে মুজাহিদ উম্মাত হিসেবে গড়ে তুলতে। একজন ইসলামী চেতনা সচেতনতা সমৃদ্ধ মা তার সন্তানকে পশ্চিমা অপসংস্কৃতি ও অন্যায় অত্যাচার জুলুমের বিরুদ্ধে লড়াই করার প্রেরণা দিতে পারে।আমরা আমাদের সন্তানদেরকে উত্তম মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ। সন্তান মায়ের অনুকরণীয় হয় সে দৃষ্টিকোণ থেকে একজন কন্যা সন্তানকে যদি উত্তম ভাবে গড়ে তোলা যায় উত্তম শিক্ষা দেওয়া যায় তাহলে আশা করা যায় আমাদের আগামী প্রজন্ম একটি তাকবান ,গয়রাতপূর্ণ, ঠিকমতওয়ালা মুজাহিদ উম্মাহ হিসেবে গড়ে তোলা সম্ভব। যাদের একমাত্র উদ্দেশ্য থাকবে আল্লাহর সন্তুষ্টিতে জীবন পরিচালনা করা ও আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য লড়ে যাওয়া।

পাশাপাশি পরিবারের অন্য সদস্যদেরও উচিত নারী শিক্ষার পথ সহজ করা এবং ঘরে দ্বীনি পরিবেশ বজায় রাখা।

ইসলামি শিক্ষায় গড়ে ওঠা একজন নারীই পারে পরিবারকে ভাঙনের হাত থেকে রক্ষা করে তাকে প্রশান্তি, ভালোবাসা আর বরকতে ভরে তুলতে।

তথ্য সূত্র

১, মাসিক আল - কাউসার
২, ইসলামিক আইন ফতোয়া -IOM
৩, পারিবারিক কলহ ও প্রতিকার-আল্লামা মুফতি তাকে ওসমানি
৪, নারীর ইসলামী জীবন -মুফতিআব্দুল গফুর
৫, ফ্যামিলি ম্যানেজমেন্ট ও জন্মনিয়ন্ত্রণ -ইঞ্জিনিয়ার খন্দকার মারছোস
৬, বাগদান ও বিয়ে কিছু প্রথা কিছু কথা-মুফতি আহমদ খানপুরী
৭, হৃদয়ের পবিত্র বন্ধন- মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ